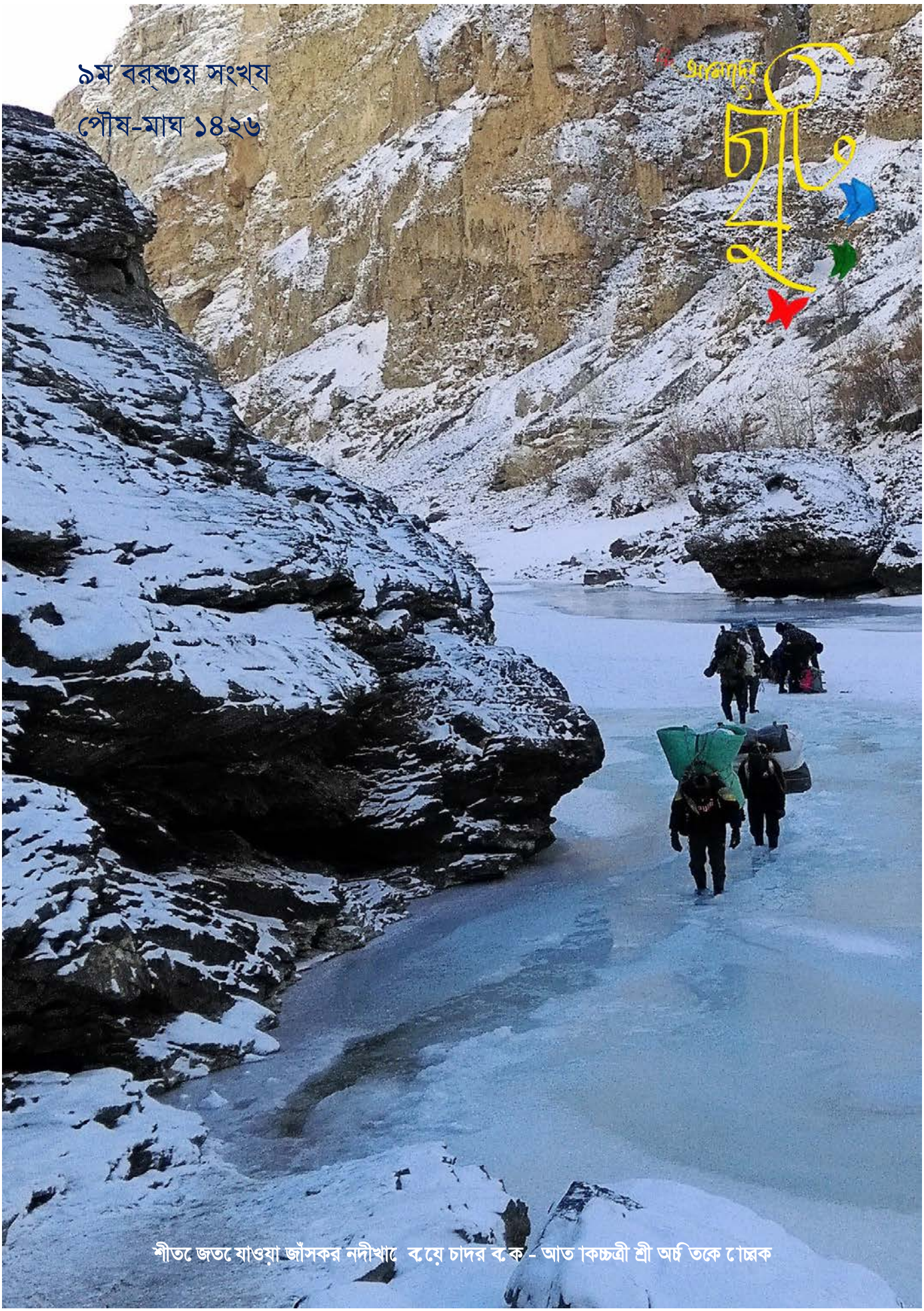

৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
পৌষ-মাঘ ১৪২৬
আমাদের ছুটি
শীতে জমে যাওয়া জাঁসকর নদীখাদ বেয়ে চাদর ট্রেক - আলোকচিত্রী শ্রী অর্চিতকে ঘোষক

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

~ ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা - পৌষ-মাঘ ১৪২৬ ~

কোণার্কের সূর্যমন্দির দেখতে গিয়ে ভ্রমণকারী আজকাল আর আশ্চর্যে মুগ্ধ কোনটাই হন না। আমি কিন্তু হই, এখনও, বারবার। আর বারবার সেই মনটা আবার একটু বোধহয় খারাপ হয়ে যায়। প্রতিবারই মনে হয় আগেরবারের থেকে আরও কয়েকটা মূর্তি ক্ষয়ে এসেছে, কোনও মূর্তির দেহ ঠাঁই পাল্টে থাকতে পারে। বুঝতে পারি আসলে কালের নিয়মে একটু একটু করে মন্দিরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। কারণ ছোটবেলায় যখন অজন্তা দেখতে গিয়েছিলাম কিংবা দেখা পাহাড়ের আড়ালে মন্দির চিত্রগুলো দেখতে দেখতে। মনে হয় আর পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো এর অনেককিছুই একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। উত্তরপুরুষের কাছে অতীতের এই ঐতিহ্যের পরিচয় কিছু আর থাকবে না। সময়ের সঙ্গে ক্ষয় ধরায়ই, ক্ষয় ধরায় সময়ও। আবার সময়ই পারে ঐতিহ্যের যত্ন নিতে।

একবার একটা বইয়ে পড়েছিলাম সম্ভবত একজন ইতালিয়ান না ফরাসী শিল্পী বছরের পর বছর কোনো এক গুহায় একা একাই বছরের পর বছর ধরে বেশ কিছু গুহার ভিতরের চিত্রগুলির সংরক্ষণ করতেন আধুনিক উপায়ে। অজন্তার কথা মনে হচ্ছিল খবরটা পড়তে পড়তে। এবারে কোণার্কে গিয়ে দেখলাম আর জগমোহনের প্রথম ধাপটাতেও উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। মন্দিরের একটা অংশে মূর্তিগুলির ওপরে সিমেন্ট কিংবা কোনও সাদা প্রলেপ লাগানো হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। হয়তো পরিস্থিতি বিবেচনা করেই করতে হয়েছে, কিন্তু দেখতে ভরসা হয় না। সত্যিই কি পৌঁছতে পারবে কোণার্কের অপরূপ শিল্পগুলি? মন্দিরের দেওয়ালে নানান ভঙ্গিমায় পাশাপাশি দাঁড়ানো স্বামী-স্ত্রীর যে মূর্তির ঠোঁটের কোণায় হাজার বছর ধরে প্রেমের হাসির রেশ লেগে আছে, তা আমাদের পরের প্রজন্মেরা এসে আর দেখতে পাবে কি?

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"দিল্লীর নানাদিকের ইতিহাসের সঙ্গে এমনি জড়িত ও এখানে দেখবার জিনিস এত বেশী যে, কম-সময়ে এড়িয়ে চ'লে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এদিকে কাশ্মীরের প্রচণ্ড শীতের দিনও ঘনিয়ে আসছে। দেরী করলে হয়তো বরফের জন্যে পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে - শ্রীনগরে পৌঁছোবার আশা ত্যাগ করতে হবে।"

- শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে "সাইকেলে কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের পথে"

"কম্ব ঢেকে চোখ বুজে কতরোইতরর ঠান্ডার একটা দুই আ সি পাওয়া ে । একটা সন্ত্রাসবাদী হাওয়া কতক্ষ র দওয়াত ঝাপটা োরতে উঠতে হতে যে সকাত পারা যায় এখান েতক পা তনর টাতচ্ছে। োড়া আজ েনাে অ্যাটেম্পট করার কো।"

অর্চ িতকে োনোজ্জর 'জকদার ভ্র তণর ুকেত ট'-এর িতীয় পে

~ আরচাানে র ~

মুর্শিদাবাদ-ো দা ভ্রণে - শী া চক্রবেতী

সপ্তাহ-অন্তর ভ্র তণোং ার কা োষ্টর
ে ি র - অপূর্বচেতটাপাধ্যায়

সাা িতরর জাতীয় শহদ-স্মৃচ কাধো
- অতীন চক্রবেতী

~ সে কাঅাচের দেশ ~

একটি চাদরাহে অভিজ্ঞতা - অভিতকে ে াষক

পুরীঃ ে াধতকের ে ারাণসী - ে পন পা

গুজরাতটেদাে েজে ও পশুরাজদর্শনে
- অদ্রি ে দত্ত

ে ছ যাস্নতে কানাঝরা চ তক - অদ্রি ে পাত্র

~ ভ্রমণ ~

ও তিজতদর দতশ- পরাত রঞ্জন দত্ত

আনন্দ্ ঃ ক্যানিয়ান ঐতি হতে এবং সংস্কৃতি র পীঠস্থান
- সম্প তকাত, সায়ন্তকা ক্যাত

~ কালেপাতা ~

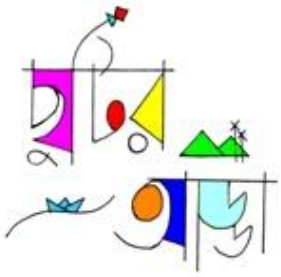

হ ং-এ দুরাচ্ছর - গোপাচ ক েন্ম

নেশঙ্করী আম্মার চেরি দশম - চেচ্ছৎ সাধু

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 2020 **AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu**

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

['সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত' -এই ভ্রমণকাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে বেরোত প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত কোনও নাম নয়। আজকের ইন্টারনেট-গুগুল ম্যাপ-ইন্সটাগ্রাম-ফেসবুক লাইভ যুগের তরুণ-তরুণীদের জন্য এখানে রইল প্রায় একশো বছর আগের কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বাঙালি তরুণের ভ্রমণকথা।]

সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

দিল্লী

১০ই অক্টোবর, শনিবার - আমাদের মতন ভ্রমণকারীদের পক্ষে নিজের শরীর ও সাইকেলের প্রতি মনোযোগী হওয়া বিশেষ দরকার। বেনারসের পর বিশ্রাম ও সাইকেলের যথাবিধি সংস্কার দিল্লীতে করা হ'বে আগে থেকে স্থির ছিল। আর দিল্লীর নাম ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত ও এখানে দেখবার জিনিস এত বেশী যে, সে-সমস্ত এড়িয়ে চ'লে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এদিকে কাশ্মীরে প্রচণ্ড শীতের দিনও ঘনিয়ে আসছে। দেরী করলে হয়ত বরফের জন্য পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে - শ্রীনগর পৌঁছবার আশা ত্যাগ করতে হবে। সেজন্যে এখানে দু দিনের বেশী থাকা সমীচীন হবে ব'লে .বাধ করলাম না। দুপুরের বিশ্রামের পর সাইকেলে সহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। আজ পিছনে কোন বোঝা না থাকায় অনেকদিন পর 'সাইকেল চড়ার 'আরামটুকু বেশ উপভোগ করা গেল।

প্রাচীনকালের কথা বাদ দিলে দিল্লীকে মোটামুটী দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, অর্থাৎ মুসলমান-যুগের ও আধুনিক ইংরেজ আমলের। পুরানকালের দিল্লীই সাতটি। এক-একজন সম্রাট্ নিজের নিজের খেয়াল ও সুবিধা মত এক-এক জায়গায় তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের সকলের রাজধানীরই কিছু-না-কিছু চিহ্ন এখনও গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর আধুনিক দিল্লী দুটি-একটি স্থায়ী রাজধানী যা এখনও সম্পূর্ণ তৈরী হ'য়ে ওঠেনি ও অপরটি অস্থায়ী রাজধানী, এখন যেখানে রাজধানীর কাজ-কর্ম্ম হ'য়ে থাকে। বিজলী বাতী দেওয়া সুন্দর চওড়া রাজপথ ঘাসে-মোড়া বাগানের উপর শাদা রংয়ের সারি সারি সৌধশ্রেণী ও একছাঁচে ঢালা সরকারী বাড়ীগুলির দৃশ্য যেমন মনোরম এদের গঠন-প্রণালীও তেমনি সুরুচির পরিচায়ক।
দিল্লীর রাস্তায় টাঙ্গারই চলন বেশী, ট্রামও আছে। ট্যাক্সি যে নেই তা নয়, তবে কলকাতার মতন এত বেশী নয়। মোড়ে মোড়ে কোন্ সময় থেকে গাড়ীতে আলো জ্বালতে হবে তার নোটীশ দেওয়া রয়েছে। এবিষয়ে কলকাতা অপেক্ষা দিল্লী-পুলিসের ঢের বেশী কড়া নজর। ষ্টেশনের পাশেই কুইন্স্ পার্ক্, কতকটা কলকাতার ইডেন গার্ডেনের মতন; তবে এর ভেতর দিয়ে লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া যাবার পথ রয়েছে, যা কলকাতার কোন পার্কেই নেই।

১১ই অক্টোবর রবিবার - সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া ক'রে কুতবের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, এখান থেকে ১১ মাইল দূর। সময় বড় অল্প। এরই মধ্যে যা-কিছু ঘুরে দেখে নিতে হবে, সেজন্যে টাঙ্গা ভাড়া ক'রে ঘোরার চেয়ে সাইকেলে যাওয়াই সুবিধাজনক হবে ব'লে বোধ হ'ল।
সহরতলীর গা ঘেঁসে নূতন রাজধানী হচ্ছে, তারই মধ্য দিয়ে কুতব যাবার পথ। পাশে পাশে সরকারী দপ্তরখানার গোড়াপত্তন সুরু হয়েছে। বড় বড় কপি কল (Crane), পাথরের টুকরা, প্রয়োজনীয় মাল-মসলা ও লোকজন মিলে সেখানে একটা বিরাট ব্যাপার ক'রে তুলেছে।
এসব ছাড়িয়ে একেবারে সহরের শেষে এসে পড়লাম। মাইলের পর মাইল রাস্তা চ'লে গেছে, সুন্দর সমান আর দু'ধারে নূতন ধরণের শ্রেণীবদ্ধ আলোর স্তম্ভ। এরই পাশে রোদে-পোড়া তৃণশূন্য শুষ্ক মাঠ, মাঝে-মাঝে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংস স্তূপ, কোথাও বা লতাগুল্মবিহীন পাহাড়ের এক-আধটা ছোট-খাট সংস্করণ।

মোগল-সেনাপতি সফদরজঙ্গের সমাধির সুমুখ দিয়ে কুতব মিনারের পথ। এইপথে প্রথমেই চোখে পড়ে মহারাজ জয়সিংহের তৈরী অসম্পূর্ণ 'যন্তর মন্তর' বা মান-মন্দির। সেনাপতি সফদরজঙ্গ বহুদিন অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সমাধিটি সম্রাট্ হুমায়ুনের সমাধির অনুকরণে লাল পাথরে তৈরী। চার পাশে ছোট-ছোট অসংখ্য ঘর দিয়ে সমাধি-মন্দিরের সীমানা তৈরী হয়েছে।

আরও ৬ মাইল পরে কুতব মিনার। মিনারের গঠন সুরু হয় কুতবউদ্দিনের হাতে, আর সম্রাট্ আলতামাস একে সম্পূর্ণ ক'রে তোলেন। মিনারটি এক পাশে একটু হেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ বলেন,পৃথ্বীরাজ না কি এর খানিকটা তৈরী করিয়েছিলেন, এর ওপর থেকে সংযুক্তা যমুনা দেখবেন ব'লে। ২৩৮ ফিট উঁচু মিনারে আমাদের গুনতি হিসাবে দেখা গেল ৩৭৯ ধাপ আছে। এর চেয়ে যে মিনারটি আরও-কিছু উঁচু ছিল তা বোঝা যায় এর উপরের কয়েকটি ধাপের ভগ্নাবস্থা দেখে। মাথাটি একেবারে খোলা, হয়ত উপরে অন্যান্য মিনারের মতন এক সময় আবরণ ছিল। তবে চারপাশে এখন সরকার বাহাদুর রেলিং ক'রে দিয়েছেন। নীচে থেকে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উপরে উঠতে হাঁফিয়ে যেতে হবে ব'লে যেন পর পর চারিটি বারান্দা করা হয়েছিল। এই

বারান্দাগুলির জন্যেই কোনরকমে উপরে ওঠা যায়, তা না হ'লে দিন-দুপুরেও আলো না নিয়ে ভিতরে ঢোকে কার সাধ্য! বাইরের দিক্ দিয়ে নীচে থেকে উপর অবধি মিনারটিকে ঘিরে ফার্সী বয়েৎ লেখা। এখানে সমাধি, মসজিদ সব জায়গাতেই এমনি ফার্সী বয়েতের ছড়াছড়ি।

এরই একপাশে কুতব মস্জিদ ও প্রাঙ্গণে লৌহস্তম্ভ। আশে পাশে অসংখ্য ছোট-খাট সমাধি। কুতব মস্জিদ হিন্দু মন্দির ধ্বংস ক'রে যে তৈরী করা হয়েছে তা দেয়ালে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখে বেশ বোঝা যায়। এই মস্জিদের দেয়ালে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের হিসাব-অনুযায়ী দেখা গেল ২৭টি মন্দির ধ্বংস ক'রে এই মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল।
মিনারের প্রাঙ্গণের লৌহস্তম্ভটির গায়ে পালি ভাষায় লেখা আছে চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গ-বিজয়ের স্মরণার্থে বিষ্ণুদেবের উদ্দেশ্যে এটিকে তৈরী করিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর নাম অশোক স্তম্ভ। স্তম্ভটি যে-লোহা দিয়ে তৈরী তার এমনি বিশেষত্ব যে হাজার দেড় হাজার বছরের জল ঝড় মাথা পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে - গায়ে তার একটু মরিচা ধরেনি। সহজেই বোঝা যায় সেকালের বৈজ্ঞানিকদের লৌহশিল্পে কত বেশী জ্ঞান ছিল। কাছেই পৃথ্বীরাজের মন্দির। পৃথ্বীরাজের রাজধানী এইখানেই ছিল, আসে পাশে তারও ধ্বংসাবশেষ প্রচুর।

সহর থেকে দূর বলে এখানে চা জলখাবারের বন্দোবস্ত আছে। তবে তার সেলামী সহরের চেয়ে অনেক বেশী। হুমায়ুনের সমাধির পথ ধ'রে ফির্লাম। সফদরজঙ্গের সমাধিরই যেন উন্নত সংস্করণ। এর ফটকে দরজায় ফাটল ধরেছে। সাদা, কাল ও লাল এই তিন রংয়ের পাথর দিয়ে সমাধিটি তৈরী। হুমায়ুন-মহিষী হামিদা বেগম এটি তৈরী করান। এখানে সম্রাট্ ও মহিষী দুজনেরই সমাধি রয়েছে দেখা গেল।
দিল্লী গেট পার হ'য়ে সহরে ফিরে এলাম। বাঁ পাশে চাইতেই চোখে পড়্ল জুম্মামসজিদ। ছোট-ছোট অসংখ্য ধাপ পার হ'য়ে উপরে উঠেত হয়। ডানদিকে শাহজাহানের তৈরী লাল পাথরে গড়া দূর্গের প্রাচীর সুরু হয়েছে। ফটকের সামনে আসতেই কতগুলি গাইড এসে পাকড়াও করলে। ফটকের পরেই পথের দুধারে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর। সেগুলি আগে বোধহয় সৈন্য সামন্তদের, তাঁবেদারদের থাকবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সোডা, লেমনেড, পান, সিগারেটের দোকানে পর্য্যবসিত হয়েছে। একটা খিলান পার হ'য়েই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে গাইড্ আমাদের দেওয়ান-ই-আমে নিয়ে হাজির করলে।

দেওয়ান-ই-আম থেকে বার হ'য়েই ডান দিকে শ্বেতপাথরে তৈরী দেওয়ান-ই-খাস। কয়েকটি মোটা মোটা থামের ওপর এর ছাদ। এইখানেই তখত-ই-তাউস্ বা ময়ূর-সিংহাসনে ব'সে শাহজাহান মোগল সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আবার এই ময়ূর-সিংহাসন থেকেই ঔরংজীব মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে এলেন। সম্রাটের সামান্য ইঙ্গিতে কত আশা, ভরসা, হাসি, কান্না, হা-হুতাশের অভিনয়ই না এখানে হ'য়ে গেছে। আবার নিয়তির কঠোর পরিহাসে এইখানেই সেই সম্রাট্-বংশধরেরা বিদেশী বিজেতার কাছ থেকে অপমানের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।
এই দেওয়ান-ই-খাসের সামনের খিলানের ওপরের ফার্সী লেখার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাইড্ আমাদের পড়তে বললে। আমাদের নিজেদের এ বিষয়ে অক্ষমতা জানালে সে নিজেই প'ড়ে গেল -
অগর্ ফিরদৌস্ বর্ রুহে জমীনস্ত
হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত।
অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গ যদি থাকে কোনখানে

এইখানে, এইখানে, তাহা এইখানে।
দেওয়ান-ই-খাসের এ দুলাইন লেখা সম্বন্ধে কে না শুনেছে? মোগল আমলের গৌরবময় অতীতের কথা ভেবে মন সম্ভ্রমে ভ'রে গেল।
দেওয়ান-ই-খাসের উত্তরে সোণার কলাই করা গম্বুজওয়ালা শ্বেত পাথরের মসজিদটির দিকে আপনি চোখ পড়ে। এটির নাম মতি মসজিদ। বাদ্শা ঔরংজীব এই মসজিদটি তৈরী করান কেবল তাঁর ও সম্রাজ্ঞীর উপাসনা করবার জন্যে। আর একটু দক্ষিণে রঙমহাল বা রাজপরিবারের বাস-গৃহ।
এই বিশ্রামের দু দিনেও ৩৩ মাইল ঘোরাঘুরি হয়ে গেল - মিটারে মোট ৯৫৫ মাইল।

১২ই অক্টোবর সোমবার - কলকাতা থেকে মনিঅর্ডার আসার কথা আছে, কিন্তু কোন খবর নেই। সেইজন্য প্রাতরাশ সেরে, রওনা হ'বার আগে পোষ্ট অফিসে একবার খোঁজ নিতে গেলাম। আমাদের চিঠি-পত্র, টাকা-কড়ি সবই পোষ্টমাষ্টারের হেফাজতে আসার কথা। যাঁরা এরকম ভ্রমণে বেরোন এ ভিন্ন তাঁদের আর কোনো ভাল উপায় নেই। চিঠি-পত্র আমরা বরাবর পোষ্ট অফিস থেকে নিয়ে আস্ছি, কিন্তু এইবার টাকার বেলায় গোলমাল বাধল। টাকা হাজির, কিন্তু সনাক্ত কর্বার জন্য কোন স্থানীয় লোক সঙ্গে না থাকলে পোষ্ট অফিসের কর্ত্তাদের টাকা দেবার নিয়ম নেই। অগত্যা কাশ্মীর গেটে আমাদের প্রোফেসর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শীঘ্র টাকা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ ক'রে আমরা ফিরে এলাম।
রওনা হ'তে ন'টা বাজ্ল। পানিপথের উদ্দেশে রওনা হ'লাম। পর পর দু'টি ফটক পার হ'য়ে সহরের বাইরে যেতে হয়। দিল্লী সহর হঠাৎ শেষ হ'য়ে গেল। এই বিশেষত্বটা সহজেই চোখে পড়ে, এত বড় সহরের সহরতলী ব'লে কোন জিনিস নেই।
প্রখর রোদ, জনশূন্য পথের ওপর কেবল আমরা চারজন। যতদূর দেখা যায় সবুজের লেশমাত্র নেই। ধূসর রংয়ের মাঠের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। গরমও যেন আজ বেড়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝে একটা আগুনের মতন গরম হাওয়ার হলকা মুখের ওপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। ক্বচিৎ মাঠের মাঝে ফণীমনসার ঝোপ বা এখানে সেখানে দুএকটা নিম গাছ যেন প্রকৃতির এই নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘূর্ণি-হাওয়ায় বালি উড়ে আমাদের সমস্ত শরীর ভরিয়ে দিয়েছে।
ঠিক ১৫ মাইল পর দিল্লী প্রদেশের সীমানা শেষ হ'ল। তেষ্টায় অস্থির, কিন্তু এখানে জল পাবার কোন উপায় নেই। আরও কিছুদূর এগিয়ে রাস্তার বাঁ ধারে রাই-ডাকবাংলো দেখতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্লাম। তেষ্টার চোটে সেখানে এমন জল খেয়েছিলাম যে, শেষে সাইকেল চালানই কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়াল।

বেলা ১টা। কুড়ি মাইল এসেছি, কিন্তু রাস্তার পাশে গ্রাম বা বসতির চিহ্নমাত্র নেই। এতদিন পথে খাবার পাওয়া যেত ব'লে আমরা বেরোবার আগে আর খাবার কিনে বোঝা বাড়াতাম না। আজ হঠাৎ গ্রামবিহীন পথে একটু মুস্কিলে পড়্লাম। কিছুক্ষণ পরে রাস্তার পাশে এক পথনির্দ্দেশক ফলকের ওপর দৃষ্টি পড়্ল। সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে চললাম দেখ্বার জন্যে। রাস্তা থেকে মাইল দেড় দূরে মারথাল গ্রাম। সেখানে কিছু খাবার মিলবে আশা হ'ল, কিন্তু পথের নমুনা দেখে আর যেতে ইচ্ছে হয় না। কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে নেমে পড়্লাম বালির রাস্তায়। মনে মনে আশা, খানিক পরেই রাস্তার অবস্থা ভাল হবে। কিন্তু তা হ'ল না, বালির ওপর দিয়ে সাইকেল চল্বে না। অগত্যা হাঁটতে-হাঁটতে যখন মারথাল গ্রামে পৌঁছলাম তখন বেলা আড়াইটা। গ্রামের ভেতর রাস্তার বালাই নেই। এক বাড়ীর উঠান দিয়ে, অপর বাড়ীর ভেতর দিয়ে দোকানের সন্ধানে চললাম। গ্রামের কুকুরের দল আমাদের আবির্ভাবে তারস্বরে চীৎকার করতে সুরু ক'রে দিল।
মিছামিছি এতকষ্ট স্বীকার ক'রে আসাই সার - লাড্ডু বা ঐ জাতীয় মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। দোকানের সামনে কুকুরের দল আর ভেতরে মাছির ভন্ভনানি। গ্রামের এক প্রান্তে একটি ছোটখাট ইংরেজী স্কুল দেখতে পেলাম। গুরুমশায় ও পড়ুয়ারা সকলেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। গ্রামের বাড়ীগুলির ছাদ পর্য্যন্ত মাটির। এখানকার মাটি বাংলা দেশের মতন নরম নয় আর বৃষ্টিও ওখানে আমাদের দেশের মতন অত বেশী হয় না ব'লে মাটির ছাদেও এখানে বেশ চ'লে যায় - বর্ষায় অসুবিধা হয় না। দেয়াল ও ছাদের রং একই রকমের ব'লে দূর থেকে বোঝা যায় না যে, ঘরের ওপরে ছাদ আছে। পাঞ্জাবের সীমানায় এসেছি বটে, কিন্তু এখানকার লোকজনের ধরণ-ধারণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের কিছু পরিবর্ত্তন নজরে পড়্ল না। এখানকার লোকেদের চেহারাও পাঞ্জাবীদের মত লম্বা-চওড়া নয় বরং যুক্তপ্রদেশের লোকেদেরই অনুরূপ।
আবার সেই দেড় মাইল বালি ঠেলে ট্রাঙ্করোডে ফিরে আসা গেল। পানিপথ এখান থেকে ৩৩ মাইল দূর। আজ সেইখানে রাত্রিবাস করা হ'বে এই রকম ঠিক আছে। সেইজন্যে আর দেরী না ক'রে রওনা হ'য়ে পড়্লাম।

সন্ধ্যা হয় হয়। আলো জ্বালার জন্য দিয়েশালাই বার ক'রে দেখি বাক্স একবারে খালি। মুস্কিল? পানিপথ এখনও ঘন্টা দেড়েকের রাস্তা। অন্ধকারে এতক্ষণ অজানা পথে চলা বড় যুক্তিযুক্ত হবে ব'লে মনে হ'ল না। সন্তর্পণে চলেছি। মিশকালো অন্ধকারে রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ রাস্তার একপাশ থেকে ঘন্টার টুং-টুং শব্দ ও মাঝে মাঝে অস্পষ্ট জটলার আওয়াজ কানে এল। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললাম। বেশীদূর যেতে হ'ল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা একদল উটওয়ালার ছাউনির ভেতর এসে পড়্লাম। প্রকাণ্ড মাঠের ওপর সারি সারি উট বাঁধা। আর তাদের পাশে বা সামনে ছোট-ছোট দল বেঁধে আগুনের সামনে উটওয়ালারা জটলা করছে। কেউ কেউ মাটির ঢেলা দিয়ে উনোন তৈরী ক'রে খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় সুরু করছে। এরা বিদেশ থেকে এইরকম দল বেঁধে উট আমদানী ক'রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মেলায় বিক্রী করে। রেল-কোম্পানীর কোনো ধার এরা ধারে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলে ও সন্ধ্যার সময় সুবিধা মতো জল পাওয়া যায়, এমনি একটা জায়গায় আড্ডা ফেলে রাত কাটিয়ে দেয়। মুক্ত আকাশের তলায় যে যার কম্বল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে - সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তাতে তাদের কোনোরকম কষ্ট বা কিছুমাত্র অসুবিধা মনে হয় না।
এদের ছাউনিতে এসে আমাদের আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হ'ল না। এদের সহজ সরল ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত সারাজীবনই এই কাজ করছে। কতবার যে তারা এই রাস্তার একদিক্ থেকে আর একদিক্ পর্য্যন্ত এইভাবে যাওয়া-আসা করছে তার ঠিক নেই। পথিকমাত্রেরই ওপর এদের যেন একটা সহানুভূতি আছে। বিহারে কোথায় যেন এইরকম এক দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। সাহস ক'রে এরা আমাদের থাকতে অনুরোধ করতে পারছিল না, কিন্তু সেই ধরণের আলোচনা আমাদের কানে এল। এদের অবস্থা সেরকম নয় আর আমাদের নিজেদের কিছু জোগাড় ছিল না ব'লে এখান থেকে দিয়েশালাই জোগাড় ক'রে পানিপথের দিকে এগিয়ে পড়্লাম।

চারপাশে প্রকাণ্ড প্রাচীরের মধ্যে পানিপথ সহর। সহরে যাওয়া-আসা করার জন্যে কয়েকটি ফটক আছে। রাত ন'টার পর একবার ফটক বন্ধ হ'লে আর ভিতরে যাবার কোন উপায় থাকে না। সরু সরু পাথর বাঁধান গলিতে বড় বড় পুরাণ ধরণের তিনতলা বাড়ীতে লোক গিসগিস্ করছে। ধর্ম্মশালা বা সরাইয়ের প্রাচুর্য্যও এখানে খুব। কিন্তু এখানে যেন হাঁফিয়ে উঠলাম। সেইজন্যে ফটক পার হ'য়ে সহরের বাইরে এসে ষ্টেশনে আশ্রয় নেবার জন্যে চললাম।
ষ্টেশনে আড্ডা ফেলার জোগাড় দেখছি এমন সময় বাঙালী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। এ পাগড়ীর দেশে খালি মাথা সহজেই নজরে পড়ে। ভদ্রলোকটির নাম শ্রীযুত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, এখানকার রেলের ডাক্তার। ষ্টেশনের পাশেই এঁর কোয়ার্টার। বলা বাহুল্য যে, ষ্টেশনে ইনি আমাদের এভাবে রাত কাটাতে দিতে রাজী হলেন না। অগত্যা তাঁর দাওয়াইখানার একটা ঘরে রাতের মতন আশ্রয় নিলাম। খাওয়া-দাওয়া আগেই হ'য়ে গেছে, বিছানা ক'রে শুয়ে পড়্লাম - চোখের সামনে ভেসে উঠ্ল উট-ওয়ালাদের ছাউনির কথা - আগুনের অস্পষ্ট আলোর সামনে ছোট-ছোট দলে বিভক্ত লোকেদের জটলা, সারিবাঁধা উটের গলার ঘন্টার টুং-টাং শব্দ আর সবল, কর্ম্মঠ, রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ-দেহধারী উট-ওয়ালাদের সহজ সরল ব্যবহার।
আজ মোট ৫৩ মাইল আসা হ'ল। মিটারে ১০০৮ মাইল উঠেছে।

- ক্রমশঃ -

(প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৩ সংখ্যা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

[মূলের বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - দ্বিতীয় পর্ব

কেদার ভ্রমণের বুকলেট

অভিষেক ব্যানার্জি

~ *কেদারের আরও ছবি* ~

পূর্বপ্রকাশিতের পর

#যা_দেখি_তাই_লিখি
##পর্ব_নয়_নয়_করে_৯
#মনখারাপ_আর_মন_ভালোর_মাঝামাঝি
#গৌরীকুণ্ডের_রাত_সকাল

তো ব্যাপারটা দাঁড়াল যে রাতকানা পাবলিকেরা হাফ টিমের প্রায় আধাঘন্টা পরে হ্যাপিডেন্ট চিবিয়ে দাঁত বের করে তার আলোয় রাস্তা দেখে জি.এম.ভি.এন. পৌঁছল। আগের টিমে অধিনায়ক ছিলেন। যথারীতি খাসা রুম পেলাম। ক্লোকরুম থেকে লাগেজের চারানা পার্টগুলোও এসে গেছে রুমে। শুধু কারেন্ট ছিল না। সুদীপ মোমবাতি . ালাল। দেশলাই কোথায় পেল জিজ্ঞেস করিনি। যাইহোক। মোমবাতির টিমটিমে আলোয় বেশ একটা তমরাজ কিলবিষ মার্কা ফিলিং হচ্ছিল। দেওয়ালে লম্বা ছায়া দুলে বেড়াচ্ছে প্রেতের মত। ক্লান্তির সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে অন্ধকার খোলামেলা হচ্ছে রাতপোশাক পরে। তাল কেটে দিল হঠাৎ আলো জ্বলে। আয়নার সঙ্গে সরল কোণে বসেছিলাম মাথা ঝুঁকিয়ে। একটা আধভাঙা ধুলোমাখা প্রতিবিম্ব স্বাগত জানালো। গিজারের সুইচ অন করে টাওয়েল নিয়ে এগিয়ে গেলাম ক্লান্ত ব্যথাতুর পায়ে বাথরুমের দিকে। ঘরের দখল নিয়েছে তখন নিবিয়ে দেওয়া পোড়া মোমের গন্ধ।
গায়ে ব্যথার জায়গায় গরম জল ঢেলে আর ভালো করে স্নান সেরে বেশ ঝরঝরে লাগল। সবাই ওঘরে আড্ডা দিচ্ছে। সেই সুযোগে কয়েকটা ফোন সেরে নিলাম। আমাদের মদমহেশ্বর-এর গাইড দাদাকে ফোন করে জানাতে হল অনিবার্য কারণবশত আমরা যেতে পারছি না। দুদিনে প্রায় চল্লিশ কিমি হেঁটে সত্যি কারো শক্তি ছিল না। আর কেদারে খরচও এস্টিমেটের চেয়ে একটু বেশি হয়েছিল। বদলে তুঙ্গনাথ আর কল্পেশ্বর করা হবে ঠিক হয়েছে। মাঝে একদিন বানিয়াকুণ্ডে 'leisure day'। বানিয়াকুণ্ড চোপতার পাঁচ কিমি আগের একটা বুগিয়াল। সেখানে ফিক্সড টেন্টের ক্যাম্প আছে। সামনে বসে অসাধারণ পিক দেখা যায়।
পা থেকে লেপের উষ্ণতা সরিয়ে পাশের ঘরের দিকে এগোলাম ক্যাডবেরি চিবোতে চিবোতে। ওঘরে সভা বসেছে। পাঁচখানা খাতা-পিতা লাশ বিছানায়। আমার আর জায়গা হয় না। ডালমুটের প্যাকেট এহাত ওহাত ঘুরছে। তার মধ্যে বুলডোজার (দেবজিৎ) একাই অর্ধেক খনিজ পদার্থ এক্সট্রাক্ট করে প্রসেসিং ইউনিটে চালান করে দিচ্ছে। আজ সবাই হালকা মেজাজে। স্যাক আর ন্যাপস্যাক-এ জিনিস অল্টার করা চলছে। সবার ক্যামেরাও ঘুরছে এ হাত ওহাত। খিদেও পেয়েছে কিন্তু যেতে কারো ইচ্ছে নেই। হাঁটু খুলে আলাদা করে রাখা আছে। হাতে করে পা তুলে স্ক্রু জায়গায় লাগিয়ে টাইট দিলে ঠিক হয় এমন অবস্থা। তবু পেটের দায় বড় দায়। সাড়ে আটটায় খেতে নামা হল। গরম রুটি,কালি দাল,গোবির তরকারি আর উপাদেয় ভিন্ডি ফ্রাই (যাঁরা ভিন্ডি খান ভীষণভাবে রিকমেন্ড করছি। এই খাবারটা আমাদের সারা ট্যুরে বাঁচিয়েছে অখাদ্য লোকি কি সবজির হাত থেকে) দিয়ে জমিয়ে খাওয়া হল। ইন্দ্র দোকানদারকে শশা রাখতে দেখেছিল। কিন্তু ব্যাটা স্যালাডে শশা দেয়নি। 'ভাইয়া ক্ষীরা হ্যায়,দিজিয়ে না,দিজিয়ে না' করে দোকানদারকে ব্যস্ত করে শশা আদায় করল। মৌরি-চিনির ডেডলি কম্বো চিবোতে চিবোতে 'খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং' করতে করতে ওপরে উঠলাম। তাপ্পর আর কি। হরিদ্বারে হোটেল থেকে পাওয়া Oyo Room-এর ফ্রি বায়োটিক-এর ক্রিম মেখে,ঠোঁটে আর নাকের বল্টুতে পুরু করে বাঙালির প্রিয় 'সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম বোরোলিন' দিয়ে আলেকজান্ডাররূপী শীতকে 'আয় তোকে দেখে নিচ্ছি' টাইপ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে লেপের তলায় সেঁধিয়ে গেলুম।
আমার ডিপ ঘুম হয়না। পাহাড়ে তো নয়ই। ঘুমের মধ্যে নিজেকেই চিনতে পারছিলাম না স্বপ্নে। একমাথা কোঁকড়ানো চুলের একটা ছেলে,ইন হিজ টোয়েন্টিজ,একটা বাঁশের বাঁশি হাতে সবুজ মখমলের মত বুগিয়ালে ছুটে বেড়াচ্ছে। খালি পায়ে। ছোট ছোট সাদা ফুল চারিদিকে। আর ভীষণ আলো। খুব রোদ। আর কিছু মনে নেই। এটুকুই। শুধু মনে আছে তার আধময়লা জ্যাকেটের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছিল একটা ছেঁড়া মোজা আর আঙুলকাটা দস্তানার তর্জনী আর মধ্যমা।

ভোর ছটায় অ্যালার্ম বাজল। রোজকার মত আমিই উঠলাম প্রথম। আজ শুধু গাড়িতেই যাওয়া তাই টেনশন কম। দেবজিৎ আর ইন্দ্র ঘুমোচ্ছে। মুখ ধুয়ে জ্যাকেটটা চাপিয়ে বাইরে বেরোলাম। সেরকম ঠান্ডা আর লাগছে না। গৌরীকুণ্ড জেগে গেছে আগেই। যাত্রীদের হাঁটা শুরু। রবিঠাকুর মনে পড়ল,"তোমার হল শুরু,আমার হল সারা।" ভদ্রলোক জীবনের সব সিচুয়েশনের জন্য কথা রেখে গেছেন বইয়ের তাকে। টুক করে তুলে নেওয়া শুধু। নীচে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করছেন কালকের দেখা বাঙালি ভদ্রলোক,ত াঁর স্ত্রী এবং পঁয়ষট্টি বছরের মা। শ্রদ্ধা হয়। মনে পড়ল ২০১১-এর কথা। সব কথা মনে পড়া ভালো না সব সময়। তখনকার সঙ্গে এখনকার গৌরীকুণ্ড মিলবে না। মন্দাকিনীর পাশে পাহাড়ে আঁশবঁটিতে আঁশ তোলা পাকা রুইমাছের মত ক্ষত। সবুজে ধূসরের ধর্ষণ। দাঁত বের করে আছে গভীরতা, আগে হাসত, এখন হিংস্র শ্বাপদ লাগে। লোকজনও কেমন মরিয়া পসরা বিক্রিতে,আবার উদাসীনও। কেমন প্রাণহীন অতিপ্রাণে ভর্তি চারিদিক। ভিখিরির কুড়ানো সারাদিনের খুচরো জিনিস ফুটো বস্তা বেয়ে একটু একটু করে গলে পড়ছে, তাতে তার খেয়াল নেই। কুণ্ড থেকে একটা পাতলা সরের মত ধোঁয়া কোন সাতমহলা বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরীর চায়ের কাপের সঙ্গে গল্প করবে ভেবে মাঝপথেই হাল ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশায়। পরে বুঝলাম ওটা কুণ্ডের ধোঁয়া না। ভেসে যাওয়া মানুষগুলোর চিতার ধোঁয়া, এই মন্দাকিনীর পাড়েই তো...। থাক সেকথা। ঘরে ফিরে এলাম। এক কাপ রোদ হলে মন্দ হত না, চোখ বুজে ঠোঁট ঠেকিয়ে খেতাম পেয়ালা থেকে পিরিচে ঢেলে, হালকা ফুঁ দিয়ে। সে ইচ্ছেও পূরণ হয়েছে। বলছি পরে।

"Should it be your wish
To fulfill mine,
Come closer you'd know for sure
How far I'm gone,how long I'm gone
Your touch is,was and always
Will be the magic wand".

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_১০_বাহানে_কর_কে_লে_গয়ে_দিল
#গুপ্তকাশির_গুপ্তশিব_উখিমঠের_ঊষা
#আমি_আছি_আগামীতে
#চেরিব্লসম

গৌরীকুণ্ড থেকে জনপ্রতি কুড়ি টাকার বোলেরো ট্যাক্সিতে উঠলাম। আমরা ছ'জন আর একজন স্থানীয়। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আরো লোক নেবার জন্য ওয়েট করবে বলছিল। আমরা টাকা দিয়ে দেব বলায় 'ফির তো কাম তমাম' বলে গাড়ির ছাদে উঠে স্যাক চাপাতে লাগল। বাঁধাবাধির কোন সিন নেই। আমরা আঁতকে উঠলাম, যদি পড়ে যায়। বলল কুছ নেহি হোগা, ইঁহা পে গাড়ি তিরিশ সে উপর নেহি যাতা। অগত্যা। গাড়ি ছুটল। সঙ্গে ঠোঙায় ভরা নতুন কোলগেট পেস্টের মত নড়তে চড়তে আমরাও। চারিদিকে একটা মন খারাপ আলো। সঙ্গে পাতকুড়ানি ছায়া পিছনে ছুটছে। এক মোড়ে একলা দুটো খচ্চর মালিকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তাদের মাথানীচুর ঘন্টা পাহাড়ের গলিতে 'চলো দেরি হচ্ছে' ডেকে বেড়াচ্ছে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম একটা ঝরনা পেরিয়ে। হর-কি-দুনের তালুকা যাওয়ার রাস্তা মনে পড়ছিল আমার আর সৌনিপ-এর।

শোনপ্রয়াগের কাছে এলাম। শোন গঙ্গা আর মন্দাকিনী মিলছে। প্রয়াগের আগের চেহারা আর নেই। ২০১৩-র বন্যা একগাদা গিলে হজম করতে না পেয়ে হাজার বোল্ডার বমি করে রেখেছে। গলা টিপে মেরেছে স্রোতদের। তাদের বয়ে চলা আহত হয়ে পড়ে আছে অববাহিকায়। যাহোক,ধুলোর পর্দাকে গাড়ির ওয়াইপার কিচ কিচ শব্দ করে সাফ করে চলেছে। ৫ কিমি যেতে দশ-বারো মিনিট লাগল। শোনপ্রয়াগের বাস স্ট্যান্ডে রোদের গামছা মেলা। কড়াইচাঁচা পাতলা দুধের সরের মত ধুলোর পরত রুকস্যাকের গায়ে। লোকাল বোলেরো থেকে দূরপাল্লার ভান্ডারীজি'র বোলেরোতে ধুলো খাওয়া স্যাক চালান হল। গন্তব্য বানিয়াকুণ্ড।
ঠিক হল গুপ্তকাশী আর উখিমঠ-এ স্টপেজ দিয়ে মন্দির দর্শন করে যাওয়া হবে। গাড়ি চলেছে গড়গড়িয়ে। ভান্ডারীজির মুড ভালো না। ওকে যেই বলা হয়েছে প্ল্যান চেঞ্জ, বানিয়াকুণ্ড-এ থাকব আর কল্পেশ্বর যাব জোশি মঠের দিকে হেলাঙ হয়ে, ওর তার কেটে গেছে। এত এক্সট্রা তো আমি যেতে পারব না। 'এরকম প্ল্যান পাল্টালে হবে না, আমি কোথায় থাকব' এইসব নানা অভিযোগ। পার ডে নির্দিষ্ট টাকার হিসেবে ওনাকে বুক করেছিলাম। তাই আপত্তি থাকার কথা নয়। তবু আপত্তি। হয়ত তার বিভিন্ন ড্রাইভারসুলভ কর্মকান্ডের রুটিন ঠিক করা ছিল। সেটা হুট করে পাল্টালে রাগ হবেই। পিছন থেকে এক ঝলক দেখে মনে হল টিকিটা যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে রাগে। দেখার ভুল হতে পারে, সানগ্লাস পরে ছিলাম। যাই হোক। ক্যাপ্টেন জয় ও গাড়ির মালিক-এর কথোপকথনের পর ভান্ডারীজির কাছে কিছু নির্দেশ এল। অতঃপর, ভালো রাস্তায় গাড়ির গতি বাড়ল আর আমরাও শান্তি পেলাম।

গুপ্তকাশি পৌঁছে গেলাম তাড়াতাড়ি। এখানে মন্দিরে ওঠার গেটের উল্টোদিকেই একটা দোকানে,ভান্ডারীজি বললেন,ভালো আলুর পরোটা পাওয়া যায়। এর আগে উনি যে দোকান বলছিলেন ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ-ই নাকচ করে এগোতে বলছিল। যাইহোক এর বেলায় তা না করার কারণ পেটে ছুঁচোর ডন। গরম আলুর পরোটা আর আলু মটর কা সবজি এল। সঙ্গে গুলাবজামুন। অসাধারণ তার টেস্ট। আরেকটু হলে তরকারির ঝোলের সঙ্গে আলুর টুকরো ভেবে নিজের আঙুলটাও খেয়ে ফেলেছিলাম। দাম বেশি না। তিরিশ টাকা পিস। দাম মিটিয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে গাড়িতে বসলাম। জয় গেল চৌখাম্বাকে ক্যামেরায় ধরতে। বাকিরা মন্দিরে পুজো দিতে। আমার আগেই যাওয়া। হাঁটুর কটকটানির জন্য আর অতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করল না। এতদিন পর সুযোগ পেয়ে প্রিয় খাদ্য ল্যাদ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি ভান্ডারীজি ওষুধ খাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করতে বলল তেজ বুখার। ডাক্তার দেখিয়েছে। ওষুধ খাচ্ছে। ভালো করে তাকাতে দেখলাম চোখটা লাল। মায়া হল। আমার ব্যাগভর্তি ওষুধ। বললাম কোন সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে বলতে। তিনিও 'জি আচ্ছা' বলে কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে সামনের দরজাটা ঢাই করে বন্ধ করে উদাস চোখে আড়াই ইঞ্চি লম্বা উত্তরাখন্ডি বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিলেন। বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে উড়তে লাগল হতাশা।
একটু পরে ছেলেপুলে ওয়াপিস এলে আবার স্টিয়ারিং নড়ে উঠল। গন্তব্য উখিমঠ। বৈচিত্র্যহীন দু'ঘন্টার পর উখিমঠ পৌঁছলাম। এখানে শীতে কেদারনাথজির ডুলি থাকে। পুজোও হয়। মঠ কাম মন্দিরে ঢোকার মোড়টাতেই এক বাস চালক এক গামবাট বাস দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। রাস্তার দুদিকে সার দিয়ে গাড়ি পার্ক করা। আমাদের গাড়ি গেছে আটকে। বাসকে বেরোতে দিলে আমাদের গাড়িকে প্রায় দুশোমিটার ব্যাক করতে হবে। ভান্ডারী এমনিতেই রেগে ছিলেন। পুরো তার কেটে ফিউজ উড়ে গেল এবার। খিস্তির টাগ অফ ওয়ার চলল। মাঝখানে আমাদের

নেমে যেতে বললেন। আমরা ওইটুকু এগিয়ে এসে পুজোর দোকানে সামগ্রী কিনছি দেখলাম ভান্ডারী অন্তত ৩০ কিমি গতিতে রিভার্স করে গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন অবহেলায়। মনে মনে স্যালুট করে মন্দিরে ঢুকলাম।

সেই মহাভারতীয় পাথরের কাজের মন্দির। একটু ওড়িশি আর একটু দক্ষিণী স্টাইলও আছে। চমৎকার রঙকরা। ইন্দ্র পুজো দিল। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পঞ্চকেদারও রয়েছেন এখানে। ডেমো দর্শন হয়ে গেল। সবাই ভিতরে। আমি চাতালের সিঁড়িতে বসে ডানদিকে তাকিয়ে দূরে কেদারশৃঙ্গ দেখতে পেলাম ব্যাকড্রপে। এখানেই রাজা মান্ধাতা তপস্যা করে ভগবান শিবের ওঙ্কারেশ্বর রূপের দর্শন পান। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাণাসুরপুত্রী ঊষার বিবাহ হয় এই মন্দিরের মণ্ডপে। যা এখনও আছে। তখন এই স্থানের নাম হয় ঊষামঠ। কালের নিয়মে যা এখন উখিমঠ।
এরপর সোজা বানিয়াকুণ্ড। মাঝখানে কোথাও একটা খাওয়ার ব্রেক। গাড়ির দিকে আসতে আসতে অনেক চেরি গাছ দেখলাম। পাতা নেই, শুধু গোলাপি চেরিব্লসমে ভর্তি। আগামী শীতের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঝরে যাওয়ার আগে খুব মন দিয়ে ফুটেছে একাঙ্ক নাটকের মত। দেখাচ্ছে ঠিক অন্যের সঙ্গে বিয়ে হতে যাওয়া নতুন গোলাপি লেহেঙ্গায় নিজের প্রেমিকার মত।

গাড়ি এগোল। একটু এগিয়ে জি এম ভি এন। ওখানে খাবার পাওয়া গেল না। বলল বাজার গিয়ে সবজি কিনে আনতে হবে দেড় ঘণ্টা লাগবে। আবার গাড়িতে ওঠা। শহরের বাইরের দিকে ভারত সেবাশ্রম। ইন্দ্র নেমে ম্যানেজ মারতে গেল এবং হাসিমুখে ফিরে এল। ইতিমধ্যে আমরা সেলফি তুলেছিলাম। ভিতর থেকে ইন্দ্র ডাকছে, পরে ফিসফিসিয়ে বলল ওকে নাকি মহারাজ বলেছে, "Is the green T-shirt guy with you? Call him right now"। যাকগে, বিনা কারণে বকুনি খেয়ে খিদে পেয়ে গেল। উপাদেয় ভাত, ডাল, তরকারি, চাটনি, পাঁপড় সাঁটিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে গাড়িতে উঠলাম। ইন্দ্রকে খিস্তি করছিলাম প্রথমে এখানে নামার জন্য। পরে এত ভালো খাওয়ানোর জন্য চুমু খেতে ইচ্ছে হল। একটা গ্রুপ সেলফি তুলে গাড়িতে উঠলাম। কাল তুঙ্গনাথ। পারব কি? মহাদেব জানেন।
"তীব্র হয়ে আসা বাঁকে
চির আরামের ঝুঁকে থাকা সাবধানবাণী,
শুরুটা বরাবরই কঠিন
শেষটা আমরা সবাই জানি।"

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_একাদশে_বৃহস্পতি_নাকি_শনি?
#টেস্টোহেডো_বনবনাইটিস

#বানিয়াকুণ্ডের_বানিয়া
ভারত সেবাশ্রমে চর্ব্যচোষ্য আর বকুনি গিলে পেট আইঢাই। কেউ সামনের সিটে বসতে চাইছে না। ঘুমোলে বকুনি শুনতে হবে ভান্ডারীজির সেই ভয়ে। ইন্দ্র সাহস করে চোখে সানগ্লাস এঁটে বসল। যাতে ঘুমোনোর টুকলি মাস্টার না ধরতে পারে। গাড়ি ছুটেছে চোপতার পথে। আমাদের আজকের রাত্রিকালীন বিশ্রামস্থল বানিয়াকুণ্ড। চোপতার পাঁচকিমি মত আগে একটা পাইনের জঙ্গলের মধ্যে ঢালু ওপেন হাফ বুগিয়াল। সেখানে অনেক ফিক্সড টেন্ট আছে। অসাধারণ ভিউ। সামনেটা পুরো খোলা। এখানে রাস্তা ভালো। গাড়ি গতি নিচ্ছে। দেবজিত মাঝখানে বসে স্পিডোমিটার দেখছে আর কমেন্ট্রি দিচ্ছে,"ভাই পঞ্চ (৫০),ভাই ষষ্ঠ (৬০),ভাই সপ্তমে তুলে দিয়েছে (দাঁতে দাঁত চিপে আস্তে আস্তে)"। সুদীপ পিছন থেকে হাল্কা পিনিক দিলো,"চোখ বুজে একটু ঘুমিয়ে নে ভাই।" আমি ব্যাগ থেকে লজেন্স বের করে সবাইকে দিয়ে একটু স্বাদ বদলের চেষ্টা করলাম আর কী।
রোদের বেলা বাড়ছে,আর সে চুনজলের উপর পাতলা অস্বচ্ছ সরের মত একটা ঘোলাটে পর্দা মেলে দিচ্ছে আলতো করে। খোলা মনে না দেখলে অবশ্য বোঝা যাবে না খোলা চোখে দেখলেও। একটু এগোতেই ডানদিকে দূরে তুঙ্গনাথ আর চন্দ্রশিলা দেখা গেল। কাউকে বলিনি। বুকটা একটু কেঁপে গেল। ওই চূড়ায় উঠতে হবে? এই কান্নিক খাওয়া হেঁচকিতোলা হাঁটু নিয়ে পারব কি? আজ যদিও রেস্ট, দেখা যাক। আকাশে দাঁড়কাক উড়ছে। পাতিকাক এদিকে দেখিনি খুব একটা। আর কিছুক্ষণ, তারপরেই পৌঁছব।

রাস্তা ছায়ায় ঢেকেছে। সারি দিয়ে পাইন উইয়ের ঢিপিতে আলপিনের মত পোঁতা আছে। উইন্ডস্ক্রিনে পাতার ছায়ারা আদর বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কথা বলছিনা কেউ। অদ্ভুত কো-ইন্সিডেন্সে ভান্ডারীজিকে দেয়া জয়ের পেনড্রাইভে "রোজা জানেমন,তু দিল কি ধড়কন,তুঝ বিন তরসে ন্যয়না"...বাজছে। বুঝতে পারছি হিমালয় গিলে নিচ্ছে আমাদের আস্তে আস্তে ক্ষুধার্ত অজগরের মত আর আমরাও মোহাবিষ্টের মতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি আবহে। হঠাৎ সাড় জাগিয়ে পিছন থেকে অধিনায়ক জয় বলল ভাই অভিষেক খেয়াল রেখো 'নীলকণ্ঠ'ক্যাম্প, একটা মোড় ঘুরে পড়বে। আর ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই অধিনায়কের বোলিং চেঞ্জ সঠিক প্রমাণ করে উইকেট পড়ল নীলকণ্ঠ ক্যাম্পে একটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মোড় ঘুরেই।
ক্যাম্প পুরো ফাঁকা। তুঙ্গনাথজির ডুলি কালই এই পথে উখিমঠের দিকে রওনা দিয়েছে। জঙ্গলের পথে তুঙ্গনাথজিকে নিয়ে যাওয়া হয় উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে। লোকাল লেজেন্ড অনুযায়ী যদি কেউ ওনার জন্য কোন ধাতব গহনা বানিয়ে রাখেন আর উনি সেটা দেখতে পান যাওয়ার পথে আর তিনি সেখান থেকে নড়েন না। শত চেষ্টাতেও ডুলি আর মাটিছাড়া করা যায় না। তাই এই ব্যবস্থা। আমরাও গাড়ি থেকে নেমে বুক ভরে সবুজের গন্ধ নিলাম। ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা ভদ্রলোকের সাথে অধিনায়কের কথা হল। আগেরবারও ওরা এখানেই ছিল। নশো টাকা করে নিয়েছিল বলায় সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন 'তাই-ই দেবেন' বলে। আলাভোলা বুগিয়ালিস সবুজের ঢাল বেয়ে উপরে টেন্টের দিকে এগোলাম। দুজন ছেলে স্যাক টেন্টে দিয়ে যাবে বলল। ভান্ডারীজিও ডাইনিং রুমে শুতে পারবেন জেনে খুশি হয়ে মোবাইলে হেডফোন লাগিয়ে উত্তরাখন্ডি বকবক শুরু করলেন।
খাসা টেন্ট। ডবল লেয়ার। বাইরে চেয়ারপাতা সঙ্গে টেবিলও। ভিতরে কিংসাইজ বেড উইথ ডবল কম্বল। সঙ্গে অ্যাটাচড টয়লেট। কোমোড বেসিন বালতি মগ সব আছে।

বাইরে বেরোলাম চেঞ্জ করে। রোদ পড়ে আসছে শেষ তিরিশের কোঠার যৌবনের মত। বেরিয়ে এসে হকচকিয়ে গেলাম। এতক্ষণে মন দিয়ে দেখলাম বানিয়াকুণ্ডকে। দূরে স্পষ্ট কেদাররেঞ্জ। মাঝখানের পিকটা চিনতে পারিনি। ডানদিকে উঁকি দিচ্ছে চৌখাম্বার দুই খাম্বা। আবার মাঝেমধ্যে লুকোচ্ছে ঘুড়িওড়া মেঘে। মাঝে আদিগন্ত ছোট ছোট পাহাড় আর তাদের পুঞ্জাক্ষি রং-কুয়াশা-ধোঁয়ায় মাখামাখি 'স্মাজড প্যাস্টেল কালার'-এর ক্যানভাস। এদিকে সেদিকে গড়াচ্ছে সবাই। এন্তার ফোটশুটের মাঝে চিঁড়েভাজা আর চা-ব্রেক হয়েছে। আর হয়েছে সৌনিপের ক্যামেরায় অপূর্ব সব সেলফটাইমার গ্রুপফোটো। একটা আমাদের মতই ছন্নছাড়া সারমেয় বলে বলে পোজ দিয়ে গেল সবার সঙ্গে। আমার বেলাতেই শুধু গায়ে উঠল আর হাউ হাউ করে চাটল,ছবি তুলতে দিল না। তার কয়েকটা বন্ধু পাখি, হিমালয়ান ইয়েলো বিলড ব্লু ম্যাগপাই (Himalayan Yellow Billed Blue Magpie) লম্বা লম্বা লেজ ঝুলিয়ে ট্রিট্রি করে উড়ে বেড়ালো আসমান জুড়ে। ছায়ারাও লম্বা হতে হতে মিলিয়ে যাওয়ার পথে। ঠান্ডা বেড়েছে অনেকটাই, জ্যাকেট টুপি চড়িয়ে বাইরে চেয়ারে বসে হাঁ করে গিলতে লাগলাম হিমালয়ান সিনেপ্লেক্স এর থ্রি ডি মুভি।
মোমগন্ধী বিকেল নিভে যাওয়ার পর একটা আবগারি শুল্ক ফাঁকিদেওয়া চোরা ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত বইতে লাগল আর আমাদেরও টেন্টের ভিতর ঢুকতে বাধ্য করল। নিচে কিচেন থেকে মর্ত্যবানী হয়েছিল আগেই রাতের পাতে গরম খিচুড়ি, ডবল ডিমের মামলেট (বলতে ভাল লাগে অমলেটের চেয়ে) আর পাঁপড়, ঠিক সাড়ে সাতটায়। কিন্তু সাতটাতেই ডাক পড়ল। একটা ভিজে ঠান্ডা অন্ধকারে সোলার লাইটের পোস্টগুলো আত্মহত্যার আদর্শ বটগাছের মত দাঁড়িয়ে আছে। আলোর জোর না খেতে পাওয়া ঝাড়গ্রামের শবরদের মত। বাইরে বেরিয়ে ঠান্ডায় একটু কেঁপে নিয়ে হেডল্যাম্প জ্বালিয়ে এগোলাম। ডাইনিংরুমে ওঠার পাথরের সিঁড়িতে দেবজিত একটু ঠোক্কর খেয়ে খিদেটা ঝালিয়ে নিল। গরম ধোঁয়াওঠা খিচুড়ি আর প্রায় পোড়া মামলেট গোগ্রাসে গিলে নিলাম গরুর মত সবাই।
সকালেই বেরোনো,তাই বিল আনতে বললাম একেবারে টাকা মিটিয়ে দেবার জন্য। পাঁচ মিনিট আড়ালে ফিসফাসের পর আমার হাতে বিলটা ধরাতেই টেস্টোহেডো বনবনাইটিস হয়ে গেল (আশা করি ব্যাখ্যা লাগবে না শব্দবন্ধটার)। পার টেন্ট নশো টাকার বদলে পার হেড নশো টাকা ধরে ভাড়া হয়েছে পাঁচ হাজার চারশো আর খাবারের বিল আলাদা। অধিনায়ক বিল দেখে স্টেপআউট করল এবং ওই আধাঘুমন্ত ফুলদুলন্ত বোলারকে সোজা স্টেডিয়ামের বাইরে পাঠিয়ে দিল ব্যাট হাঁকড়ে। ভদ্রলোকের জলের সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধ একটু বেশি হয়েছিল। তিনিও চুপচাপ মেনে

নিয়ে এবং পার টেন্ট ন'শো করে নিয়েই বোলিং রানআপে ফিরে গেলেন। শুধু বিলটি চেয়ে নিলেন। আমরাও বানিয়াকুণ্ডের বানিয়াদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে বোতলে গরম জল নিয়ে টেন্টে ফিরে এলাম আর স্ট্র্যাটেজি মিটিং-এ ঠিক হল কাল এদের ঘুম ভাঙার আগেই পগার পার হতে হবে। অতএব, ধোঁয়াগন্ধের জল দিয়ে রাত্রিকালীন পিল টপ করে পপ করে সোজা কম্বলের তলায়। আধসেদ্ধ খিচুড়ি অম্বল তৈরি করার আগেই ঘুম এসে গেল। সব ভালো যার পেট ভালো।
"লুকিয়ে লুকিয়ে এখনো দেখো আমায়,আমি জানি -
শুধু স্বীকার করোনা মুগ্ধতা,
আমাদের জল ন্যাকড়া দিয়ে মোছা স্লেটে
থেকে গেছে,এখনও,হাতেখড়িটা।"

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_১২ইয়ারির_খোঁয়াড়ি
#তুঙ্গনাথের_দেওয়াললিপি
#ট্রেক_না_এর_গল্প
টেন্টের ভিতর অন্ধকার হাতড়ে মাথার কাছে একমাত্র আলোর স্যুইচটা জ্বালালাম। কম্বল থেকে মুখ বার করে বাইরের ঠান্ডার একটা মৃদু আভাস পাওয়া গেল। একটা সন্ত্রাসবাদী হাওয়া টেন্টের দেওয়ালে ঝাপটা মারছে। উঠতে হবে। যত সকালে পারা যায় এখান থেকে পালানোর টার্গেট। তাছাড়া আজ তুঙ্গনাথ অ্যাটেম্পট করার কথা। না পারলে চোপতা বুগিয়ালে গড়াগড়ি খেয়ে চৌখাম্বা দেখে ছবি তুলে এগিয়ে যাওয়া।
যথারীতি সবার আগে আমিই বিছানা ছাড়লাম। সাড়ে পাঁচটায় চা দেবার কথা কিন্তু চারিদিক যা শুনশান মনে হয়না কেউ উঠেছে কয়েকটা পাহাড়ি ঝিঁঝিঁ ছাড়া। ধরাচূড়া পরতে পরতে বাকিরা উঠল। বাইরে সৌনিপের আর সুদীপের গলা। ভোরের আকাশ সেদিনের নতুন সূর্য প্রসব করতে তৈরি, প্রসবযন্ত্রণা উঠে গেছে আগেই। বাইরে এলাম। এই ঠান্ডাটার জন্যই পাহাড়ে আসা। প্রথম মদ খেয়ে বাড়ি ঢুকে বাবার কাছে ধরা পড়ে কড়া ধমকের মত কড়া,অথচ সঙ্গে,সামনে থেকে মা চলে যাবার পর 'লিমিটে খাবি, ছড়াবি না আর বাড়ি ঢোকার আগে পান খেয়ে নিবি'-র সু-পরামর্শের মত একটা পাতলা কুয়াশার চাদর গায়ে জড়ানো ঠান্ডা। চেয়ার এনে বসলাম। কাল এখানেই সূর্যডোবা দেখেছি, আজ উঠতে দেখব। ভালোবাসার মানুষের ঘুমোতে যাওয়া আর ঘুম ভেঙে তাকানো দেখার মত প্রজাপতি উড়ছে মনে। টুপি কান অবধি টেনে নিলাম ভালো করে।

নীল থেকে বেগুনি থেকে গোলাপির দিকে এগোচ্ছে সময়। প্রথম আলো ছুঁল কেদারশৃঙ্গে। সেই আহ্লাদী কমলা আলো ফুঁ দিয়ে কুয়াশা উড়িয়ে দিতে দিতে জাঁকিয়ে বসতে লাগল শৃঙ্গগুলির মাথায়। একটার পর একটায় সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামার মত খেলছে আলো। আমরা ছবি তুললাম যত তার থেকে অনেক বেশি দেখলাম,না,গিললাম হাভাতের মত। চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে টেন্টের চাল থেকে কুয়াশার টুপটাপ ঝরে পড়া, আমাদের ফিসফাস, পায়ের আওয়াজ, জ্যাকেটের ঘষা খাওয়া, হাওয়ার দোলা পাইন আর ভোরের আলো ফোটার শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এমন সশব্দ নিস্তব্ধতা হেরোইনের চেয়েও বেশি নেশা ধরায়। আলো যখন ঠিক গায়ে হলুদ দিল আমরাও উঠলাম। স্যাক গোছানোর অল্পকিছু ছিল। করে নিয়ে টেন্ট চেক করে নিচের দিকে এগোলাম। কাল রাতের ল্যাম্পপোস্ট ডিউটি সেরে ঘুমোচ্ছে। গাড়ির কাছে এসে দেখে শান্তি হল যে ভান্ডারী গাড়িতে শোয়নি। গাড়ির কাচে তখন সময় গড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিকের রাস্তা ঘুরে জলের রেললাইন হয়ে। কেউ মিশেছে, কেউ পারেনি আমার মত।
ভাণ্ডারীজিকে ডেকে তোলা হল। সামান্য সময় চেয়ে নিলেন ফ্রেশ হতে। আমরাও যেটা কলকাতায় জীবনে করি না সেটা করতে শুরু করলাম ওই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায়। ওই প্রাতঃভ্রমণ আর কি! একটা চায়ের দোকান খুলছে সবে। পিচরাস্তার ধার, দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির কুয়াশাভেজা টায়ার, ঝাঁটার ধুলো আর কাঠের উনুনের ধোঁয়া মিলেমিশে একটা কাঁচা সকালের গন্ধ চারিদিকে। ভান্ডারীবাবুকে চায়ের নিমন্ত্রণ দিয়ে আমরা এসে বসলাম। কালি এবং দুধওয়ালি চায়ের অর্ডার দিয়ে আগুনের কাছে জড়ো হলাম। একটা ফোটোফ্রেমের মত জানালা দোকানটার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে যেন।

ওই জানলা দিয়েই পুরো রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে গাছপালা বুকে জড়িয়ে। ওখানেই চা-দোকানের কাছে তুঙ্গনাথজির ডুলি যাত্রার গল্প শুনলাম যেটা আগেই বলেছি। ধোঁয়া, বউনি আর ভালোবাসামেশানো চা খেয়ে এবার পালা গাড়িতে ওঠার। মাত্র পাঁচ কিমি পথ চোপতা। ওখানে ব্রেকফাস্ট করে তুঙ্গনাথ ওঠা হবে। পারলে চন্দ্রশিলাও। হুশ করে পৌঁছে গেলাম চোপতা বাসস্ট্যান্ড। তুঙ্গনাথ ওঠার গেটের ঠিক উল্টোদিকে অনেকগুলো হোটেল। ২০১১-এর সঙ্গে কোন মিল নেই। তখন একদম ফাঁকা ছিল চোপতা। একটা দোকানে ঢুকে খাবার অর্ডার দেওয়া হল। আমি ভেজ ম্যাগি, ইন্দ্র রুটি সবজি আর বাকিরা আলুর পরোটা। মালিক ব্যাটা রুটির সাথে সবজির কম্বিনেশন শোনেনি তাই খালি রুটি দিয়ে গেল,তাও সবার পরোটা দেবার পর। ইন্দ্র বেচারা আর তরকারি না চেয়ে সবার থেকে একটু করে তরকারি নিয়ে খেয়ে এমবি। আমার ম্যাগিটা দুর্দান্ত বানিয়েছিল। কিন্তু এতই বেশি ছিল চেষ্টা করেও শেষের একটুখানি আর খেতে পারলাম না।

পৌনে নটা বাজে। আমাদের প্ল্যান ছিল আটটায় শুরু করা। হল না। গেটে ঘন্টা বাজিয়ে একটু এগোতেই ফরেস্ট চেকপয়েন্ট। নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ট্রেকারকে দেড়শো টাকা প্রবেশমূল্য দিতে হবে। সঙ্গে গ্রুপপিছু জন্য পাঁচশো টাকা ডিপোজিট মানি আর নিজেদের কাছে থাকা সমস্ত প্লাস্টিক সামগ্রীর হিসেব। ওঁরা সমস্ত নোট করে নিলেন নামসহ এবং প্রতিটি প্লাস্টিক জিনিসে মার্কার দিয়ে মার্ক করে দিলেন,সঙ্গে সতর্কতা যে একটিও ফিরিয়ে না আনলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা গুনতে হবে। তুঙ্গনাথ মন্দির বন্ধ,তাই সতর্ক করে দেওয়া হল যে বিকেল চারটে হল টাইমলিমিট। তার মধ্যে নেমে আসতেই হবে,ওপরে থাকা খাওয়ার জায়গা এবং জলের সোর্স প্রায় শেষ। জি হুজুরি করে টানা চড়াই ওঠার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে হাঁটা আরম্ভ হল ঠিক নটা পাঁচ মিনিটে।

সুন্দর বাঁধানো রাস্তা পুরোটাই। প্রথমটুকু পাইন, ওক, ম্যাপল, রোডো-র জঙ্গল। আরো গাছগাছালিতে ভর্তি। আর আছে লেঙ্গুর শ্রেণীর একগাদা বাঁদর। বেশ কনকনে ঠান্ডা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন বরফকুচি ঢুকে যাচ্ছে। আমি প্রতিবারের মত পিছনে। জঙ্গল মাখতে মাখতে হাপর টানতে টানতে উঠছি। পায়ে ব্যথা থাকলেও তেমন না। সেরকম কষ্ট হচ্ছে না। অধিনায়ক বলেছিল চোপতা বুগিয়াল এক ঘন্টার বেশি লাগবে। গতবার ওদের তাই লেগেছিল। আমরা সাধারণ হেঁটেও পঁচিশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম। একফালি একটা চায়ের দোকান। বয়স্ক গাড়োয়ালি কাকিমা চা খাবার অনুরোধ জানাতে সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। চৌখাম্বা স্বমহিমায় আলোর পাউডার মেখে চকচক করছে। কয়েকটা হিপি ডিপি তোলা হল আর ঠিক হল সময় লাগুক তুঙ্গনাথ উঠবোই। চারিদিক ঝকঝকে। সোনাঝরানো আলো। রোদে আসতেই একটু গরম লাগল। জ্যাকেট খুলে ফ্লিস (fleece) পরে নিলাম আর সানগ্লাসও। আস্তে আস্তে ওঠা হচ্ছে। এইসব করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছিলাম। ওরা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটা ভয়ানক চড়াই পাকদন্ডী ধরেছে বুঝিনি। একটু এগিয়ে ওই পাকদন্ডীর আশা ছেড়ে আবার বাঁধানো রাস্তা ধরলাম। মিটিং পয়েন্টে ওরা হাঁপিয়ে রেস্ট নিচ্ছিল। উঠে আবার হাঁটতে লাগল। আমি একটু বসে জল আর চকোলেট খেয়ে পিছু ধাওয়া করলাম।

আজ তাড়া নেই। বেশ স্পিডেই উঠছি। তাই সময় নিয়ে ছবি তুলতে তুলতে এগোচ্ছি। কিছু কিছু জায়গায় ফ্রস্টিং হয়ে বরফ জমে আছে। আরেকটু উঠে একটা দোকান এল। মালিকও দোকান গুটিয়ে নেমে আসার তোড়জোড় করছেন। সামান্য কিছু পসরা সাজানো। একটা লেবুজলের ব্রেক

নেয়া হল। ভদ্রলোক আমাদের এতটা আসতে দেড় ঘন্টা লেগেছে শুনে বললেন আর ম্যাক্সিমাম এক ঘন্টা লাগতে পারে। আমরাও আনন্দে এক পাক নেচে নিয়ে উঠতে লাগলাম।

আনইভেন্টফুল চকোলেট,ম্যাংগোবাইট,কাজু কিসমিস এবং ফটোব্রেকসহ পঞ্চাশ মিনিটের হার্ডকোর চড়াই ভাঙার পর পৌঁছে গেলাম তুঙ্গনাথ মন্দিরের কাছাকাছি। চারিদিকে একটা শূন্যতা। কেউ নেই কোথাও। কয়েকটা ঘর, হোটেল-মত, সব বন্ধ। ছেড়ে যাওয়ারা যেন চিৎকার করে বলছে আমরা ছিলাম,আমরা ছিলাম হৈ-হুল্লোড় আনন্দ আর বেঁচে থাকা নিয়ে। হাওয়াদের বেশ মজা হয়েছে। অলিতে গলিতে বইছে মাতাল দাঁতাল-এর মত। একটা বাঁক ঘুরতে দেখা গেল একটাই বাড়িতে কিছু লোকজন তখনও রয়ে গেছে। কয়েকজন শ্রমিক এবং রাজমিস্ত্রি সিমেন্ট মেখে কিছু একটা করছিল, সাকুল্যে দশজন হবে। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের রাস্তায় ওঠার আগে দেখলাম একটা বাড়ির দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা একগাদা শিব জি'র স্কেচ। কে এঁকেছে বোঝা গেল না, তবে এটা বোঝা গেল যেই আঁকুক তার চারকোল পেন্টিং-এর অভ্যেস আছে। কিছু আধমোছা অক্ষর যেন পেইন্টারের প্রতি কৌতূহল আরো বাড়িয়ে দিল।

ঠিক এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে মন্দিরের গেটে ঘন্টা ছুঁতে পারলাম। সৌনিপ আর ইন্দ্র মিনিট কুড়ি আগেই এসে গেছে। এসে শুনলাম সৌনিপ নাকি এগিয়ে গেছে চন্দ্রশিলার দিকে। আমাদের আর ইচ্ছে ছিল না। আমরা ছ'জন ছাড়া আর দুজন বাঙালি ভদ্রলোক,একটি সোলো মেয়ে ট্রেকার আর পাঁচজন সাউথ-ইন্ডিয়ান কলেজস্টুডেন্ট ছাড়া কেউ নেই। মন্দিরের গেট বন্ধ। ফাঁক দিয়ে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে এল না। পুজো দেবার তাড়া নেই শুধু ঘুরে দেখা আর ছবি তোলা। ঠিক হল সাড়ে বারোটায় নামতে শুরু করা হবে। একটু পরেই সৌনিপ ফিরে এল। রাস্তা খুঁজে পায়নি বোল্ডারের মধ্যে। আসলে বরফ থাকলে সুবিধে। এখন বরফ নেই। পুরোটাই শুকনো হলুদ ঘাসে ভর্তি। তাছাড়া বিকেল চারটের মধ্যে নামতেও হবে। মনভরে ফাঁকা মন্দির চত্বরে ঘুরে,শুয়ে,বসে ছবি তুলে পৌনে একটায় নামতে শুরু করলাম। চৌখাম্বার গায়ে তখন পাতলা ওড়নার মত সাদা মেঘ জড়াতে শুরু করেছে। হাঁটু একটু জানান দিচ্ছে তার আর পোষাচ্ছে না এসব। তবে বেশি গাঁইগুঁইও করছে না। আধ ঘন্টায় লেবু জলের দোকানে পৌঁছে আরেকপ্রস্থ শরবত খেয়ে ঠিক হল টানা চোপতা বুগিয়াল নামতে হবে। ওখানে কিছুক্ষণ কাটানো অধিনায়কের মনের ইচ্ছে।

চোপতা বুগিয়াল নামতে আরো চল্লিশ মিনিট লাগল। বড়ই সুন্দর থাকার কথা বর্ষার সময় এই বুগিয়ালের। এখন সবুজের ওপর একটা ধুসরের প্রলেপ পড়েছে পুরোনো কম্বলে ধুলোর মত। যেকোনো মানুষেরই এখানে বলিউডি হিরোদের মত হিরোইনকে জড়িয়ে গড়াতে ইচ্ছে হবে। আমার

হিরোইনও নেই আর ইচ্ছেও হলনা একগাদা খচ্চরের গু দেখে। মিনিট দশেক বসে উঠে পড়লাম। ছায়ারা লম্বা হতে শুরু করেছে। জঙ্গলে ঝুপসি নামার সময় আসছে। ঠান্ডাটা মালুম হচ্ছে আবার। ক্ষিদেও পেয়েছে। আজেবাজে বকতে বকতে আর দেবজিতের চওড়া কপালের জন্য আমাদের তুঙ্গনাথ হল বলে ধন্যবাদ দিতে দিতে তিনটের আগেই ফরেস্ট চেকপয়েন্টে পৌঁছে গেলাম।

"এই নাটকের সাড়ে সতেরো অঙ্ক
পর্দা ভীষণ কালো, নোনতা, ভারী
অভিনয়ের আংটি বদলশেষে
সূত্রধরই সত্যির কারবারী...।"

(ক্রমশ)

~ *কেদারের আরও ছবি* ~

জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পাহাড়ে না গেলেই ডিপ্রেশনে ভোগেন। ট্রেকে বেরোলেই ফের চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফিরে এসে লিখতে বসলেই আবার ল্যাদ খান। তবে এর পরেও কষ্টেসৃষ্টে যেটুকু লেখেন তা স্রেফ 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই। বাড়িতে চমৎকার রুটি বানান। মাঝেমধ্যে রান্না করতেও ভালোবাসেন।

কেমন লাগল : - select -

Like 15 people like this. Be the first of your friends.

tell a Friend

মত দিয়েছেন : 4

গড় : 4.50

মুর্শিদাবাদ - মালদা ভ্রমণ

শীলা চক্রবর্তী

~ মুর্শিদাবাদের আরও ছবি ~ গৌড়ের আরও ছবি ~

সিরাজ-আলিবর্দির দেশে যাবার অনেকদিনের ইচ্ছের ডানাটা মেলেই দিলাম এবার। শিয়ালদা থেকে বেলা বারোটা চল্লিশের লালগোলা এক্সপ্রেস ধরেছিলাম। ট্রেন বহরমপুর পৌঁছাল সন্ধে সাড়ে পাঁচটায়, সময়মতই। পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম শহর লালবাগ দেখতে, টুকটুক (টোটো)রিজার্ভ করে। বহরমপুর ছোটো শহর, মোটামুটি সাজানো গোছানো,জমজমাট। প্রচুর নাতিপ্রশস্ত রাস্তাঘাট, নীল সাদা টুনি জড়ানো বাতিখাম্বায় সাজানো গঙ্গার সব ঘাট, লালদিঘি এলাকাটাও বেশ সুন্দর, সেসব দেখছিলাম যেতে যেতেই। প্রচুর পুরোনো বাড়িঘর এখানে সেখানে।

হাজারদুয়ারি ও ইমামবাড়া :-

গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হবে লালবাগ। এদিন প্রথমেই গেলাম হাজারদুয়ারি। প্রচুর ঘোড়ারগাড়ি, এক্কা চোখে পড়ে ইতস্তত,সেইসঙ্গে ঘোড়ার বিষ্ঠার গন্ধ। প্রবেশপথের বাইরে বিকিকিনির কিছু দোকান, প্রচুর লোকসমাগম। পনেরো টাকা টিকিটের দাম, ফোনসহ ভেতরে প্রবেশ নিষেধ, ফোন জমা রাখতে হবে বাইরে। ভেতরে ছবি তোলা যাবেনা। সামনেই বিরাট ইমামবাড়া, বন্ধ পড়ে আছে, খোলে কেবল মহরমের সময়। নামাজ পড়া হয়। গার্ডকে বলেকয়ে টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, ভেতরে আরেকটি ভবন, প্রশস্ত চত্বর, সুন্দর সব স্থাপত্যের থামে মোড়া। অবিলম্বেই গার্ডেরা বেরোনোর জন্য তাড়া দিলেন, বেরিয়ে এলাম।

হাজারদুয়ারির বাড়িটায় আসল নকল মিলিয়ে হাজারখানেক দরজা আছে,যেকারণে নাম হাজারদুয়ারি। নবাবি আমলের ব্যবহৃত প্রচুর জিনিস নিয়ে . দর্শনশালাটি তৈরি। বিরাট বিরাট থাম, বারান্দা, বাতিস্তম্ভ দিয়ে গোটাটা সাজানো। প্রথমেই রয়েছে আর্মারি বা অস্ত্রাগার। দুটি বিশাল গ্যালারি নিয়ে তৈরি। অযত্নে অবহেলায় আটানব্বই ভাগই চুরি হয়ে গেছে শুনলাম!এখানে যে কতরকম অস্ত্র রয়েছে!!পাতলা,সরু সব পারসিক তরবারি,জার্মান তরবারি,ইংলিশ তরবারি,সূঁচালো তরবারি,বেঢপ চ্যাটালো ভারি তরবারি -একটা দিক ভোঁতা, অন্যদিকটা ধারালো... রয়েছে সিরাজ-উদ-দৌলার ব্যবহৃত তরবারি, নবাবি আমলে ব্যবহৃত লিপিখচিত,সোনারূপাখচিত তরবারি,তাদের সব হাতলের কী বাহার!!আর ছোটো খঞ্জরই বা কতো!সর্পিল আঁকাবাঁকা খঞ্জর,সূঁচালো খঞ্জর, দুমুখো খঞ্জর... তাদের বাঁটগুলো সব রূপা,হাতির দাঁত,পশুর শিং এসব দিয়ে তৈরি। গণ্ডারের চামড়ার সব ঢাল রয়েছে,কারুকাজ করা। রয়েছে পুরনো আমলের গাদা বন্দুক থেকে বিদেশি হালকা রাইফেল,ডবল থেকে চারটে ব্যারেল। পিস্তলই বা কতো রকমের,বড়ো বাঁকানো নল,ছোটো হালকা, গুলিও রয়েছে হরেক মাপের। রয়েছে গুলি রাখার ধাতব ও হাতির দাঁতের

বাক্স, বারুদ রাখার চামড়ার থলি,বন্দুক পিস্তল সব পরিষ্কার করার সরঞ্জাম। একধরনের অস্ত্র দেখলাম,নাম জমধর,লম্বা ডাঁটা,অনেকটা জাঁতির মতো দেখতে। এছাড়া রয়েছে দুটি নবাবি সিংহাসন,ওপরে চাঁদির কারুকাজকরা ঝালর,ঘরজোড়া প্রাচীন ঝাড়বাতি। রয়েছে প্রচুর হাওদা, রূপার, হাতির দাঁতের কাজ করা। রয়েছে আর্ট গ্যালারি, তাতে নবাবের পরিবার ছাড়াও বিদেশি শাসক ও তাদের পরিবারের ছবি আছে। এছাড়া নবাবের ব্যবহৃত ফিটন গাড়ি, ঢাকা ও হুডখোলা, শয্যা, টানা পাংখা, গড়গড়া, ফরাস রয়েছে। টেবিল, সোফা ইত্যাদি আধুনিক আসবাবও রয়েছে, রয়েছে বিশাল বিশাল দেয়ালজোড়া বেলজিয়াম কাঁচের আয়না, সদ্যনতুনের মতো ঝকঝক করছে। রূপাবাঁধানো ড্রেসিংটেবল, অদ্ভুত এক জাদু আয়না যাতে দুনিয়ার লোকের মুখ দেখা গেলেও হাজার চেষ্টা করেও দেখা যাবেনা কেবল নিজের মুখ। রয়েছে নবাবদের শিকারকরা বিশাল কুমির, স্টাফকরা পাখপাখালি, চমৎকার সব কাটগ্লাস ও চিনেমাটির নবাবি আসবাব।

কেবল হাজারদুয়ারিতেই এতকিছু, এটি দেখতেই কয়েক ঘন্টা লেগে যায়। আর যেটা না বললেই নয়,তা হল গাইডদের অত্যাচার,সবখানেই গাইড নেওয়ার আবদার। মূলত কিছুই জানেননা এঁরা। এঁদের থেকে সাবধান থাকতে পারলে খুব ভালো হয়।

কাঠগোলা বাগান :-

কাঠগোলা বাগানের বিস্তৃত এলাকার বিশাল দেউড়ি পেরিয়ে ঢুকতেই ছায়াঢাকা অঞ্চল,প্রচুর গাছ শাখাপ্রশাখা বিছিয়ে সূর্যের লাল চোখ আড়াল করে রেখেছে। দুপাশে বিশাল দুই ঘোড়সওয়ার রাজপুরুষের মূর্তি। তিনতলা মূলভবনটিতে একটি প্রদর্শনশালাসহ ভেতরে রয়েছে প্রাচীন মন্দির,গোপন সুড়ঙ্গপথ,ছোটো একটি চিড়িয়াখানা। বিশাল একটি পুকুর, তার বাঁধানো ঘাট নেমে গেছে ধাপে ধাপে রাস্তা থেকে,ঘাটের ধারে অসংখ্য মাছ কিলবিল করে পর্যটকদের ছড়িয়ে দেওয়া বিস্কুটের গুঁড়ো খেতে ব্যস্ত। রয়েছে একটি উঁচু, ধাপওয়ালা, নাতিপ্রশস্ত খোলা চত্বর, চারপাশে বসবার আসন সংবলিত। কানাতের আচ্ছাদনের নীচে বসে তার তলায় বাঈজিদের নাচ উপভোগ করতেন রাজারাজড়ারা, ইংরেজ অতিথিসহ। রয়েছে বেশকিছু ফোয়ারা, তাদের থামের ওপর মূর্তির কারুকাজ, বাগানে রয়েছে শ্বেতমর্মরের পরীর মূর্তি, এছাড়া ইতস্তত আরো অনেক মূর্তি রয়েছে বাগান জুড়ে।

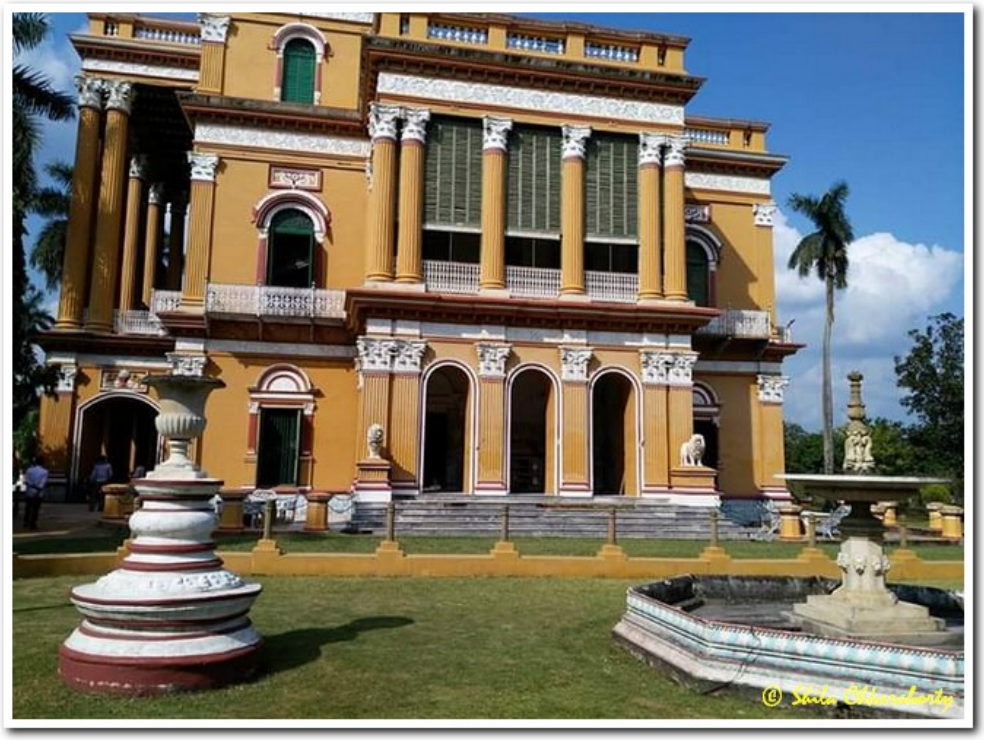

মন্দিরের এলাকাটি নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, থাম দেওয়া প্রবেশদ্বার, সামনে বাঁধানো চত্বর। ভেতরের বারান্দাটি মোটামুটি চওড়া। বারান্দা ও মেঝে সাদাকালো পাথরের, ঝকঝকে। ভেতরে জগদ্ধাত্রী, শেরাওয়ালী, রাধাকৃষ্ণসহ প্রচুর ছোটোবড়ো পাথরের মূর্তি রয়েছে মূলমন্দির ছাড়াও ঘেরা বারান্দার কুলুঙ্গিতে। দরজার ওপরে রঙিন বেলোয়ারি কাচের কারুকাজ, রয়েছে কাটগ্লাসের বেশকিছু ঝাড় ও বাতিদান। একটি বিশেষভাবে নির্মিত সাদা রঙের কাচঘেরা বাতি রয়েছে যেটি মন্দিরের ঠিক মাঝখানে লাগানো, তার সামনে এসে দাঁড়ালে ওতে ছায়া পড়ে, ফলে পেছন ফিরে বসে বা দাঁড়িয়েও বোঝা যায় কেউ এসেছে বা আসছে। সম্ভবত সতর্কতাবশত এটি লাগানো হয়েছিল।

মূলভবনটির ভেতরে ও বাইরে প্রচুর আসবাব দিয়ে সাজানো। বাইরে বিশাল দুটি ডাইনিং টেবিল-চেয়ারসহ। ছোটোবড়ো পালকি,ভেতরে ঢুকেই বিশাল হলঘরটিতে দেওয়ালের রাজকীয় কারুকাজ চোখ টানে। ঘন নীলের ওপর সোনালি কাজ, সঙ্গে মানানসই রঙিন জালি ও ভারী পরদা, দেয়ালজোড়া বেলজিয়াম কাচের বিশাল সব আয়না, ঝাড়বাতি, সোফাসেট, টেবিল। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়েও রয়েছে পুরনো ধাঁচের আলনা, ড্রেসিংটেবল, কারুকাজকরা ভারি ফ্রেমের আয়না, বাহারি নকশাকরা পায়ার ছোটোছোটো টুল ইত্যাদি। দোতলায় রয়েছে কাঠের আলমারি, ছোটোছোটো আয়না বসানো, ঘোরানো ডিজাইনের ছত্রি বসানো, ওঠবার জন্য কাঠের সিঁড়ি লাগানো উঁচু পালঙ্ক, ওপরে ফিনফিনে জালির মশারি, টানা পাখা। একটি ঘরে ঘরজোড়া গদির ফরাস পাতা। সম্ভবত বসে নাচ দেখার জন্য ব্যবহৃত হত। দুদিকে দুটো চওড়া বারান্দা রয়েছে। পিছনের ঘেরা, চিকদেওয়া বারান্দাটিতে দাঁড়ালে রাস্তা অবধি দেখা যায়। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সবুজ আর সবুজ। লনের কেয়ারি করা গাছ জুড়ে আছে বাগানের অনেকখানি এলাকা। শান্ত সুন্দর পরিবেশে পাখিদের কলকাকলি ভেতরটা নিমেষে জুড়িয়ে দেয়। সামনের বারান্দাটি জাফরিকাটা কাজের লোহার রেলিংঘেরা, সেখানে দাঁড়ালে ভেতরের অনেকটা চোখে পড়ে সামনের মাছেভরা পুকুরটিসহ। তিনতলায় বিশাল ছাদে রয়েছে একটি নিশানস্তম্ভ। ভেতরে বেশকিছু বইয়ের আলমারি, চিনেমাটির বাহারি পুরনো সব ঢাকা বড়ো পাত্র ইত্যাদি রয়েছে।

জগৎশেঠের বাড়ি :-

জগৎশেঠের বাড়িটিতেও রয়েছে একটি প্রদর্শনশালা। বাড়ির সামনেই একটি বড়ো ঘেরা জলাশয়, তার মাঝখানে শোভা পাচ্ছে একটি শ্বেতমর্মরের নগ্নিকা নারীমূর্তি। পাশেই রয়েছে জৈন মন্দির, সেখানে রয়েছে মহাবীরসহ অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও রয়েছে লক্ষ্মী, মনসাসহ। রয়েছে দুটি গোপন সুড়ঙ্গপথ। ঢুকতেই গা ছমছম করে ওঠে, নীচু ও চাপা। ভেতরে রয়েছে ছোটখাট এক অস্ত্রাগার। রয়েছে তরবারি, ঢাল, খঞ্জর, বন্দুক, পিস্তল, জমধরসহ পেতলের বেশ বড়োসড়ো এক কানকাটা কাঁচি, ব্যবহৃত হত বিজিত শত্রুবা অপরাধীর কান কেটে নিতে।

অপর সুড়ঙ্গটিতে রয়েছে জগৎশেঠের কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যাদের ব্যবহৃত বহুমূল্য সব শাড়ি,পানদান,পালঙ্ক জলচৌকি, সিন্দুকসহ নানা আসবাব, কুলদেবী লক্ষ্মীর মূর্তি, পাথর ও চিনেমাটির বাসনকোসন ইত্যাদি। মূল প্রদর্শনশালায় রয়েছে প্রাচীন কারুকাজকরা পালঙ্ক যাতে জগৎশেঠ শয়ন করতেন,তার চারটি পায়া হল চারটি কাঠের পুতুল। রয়েছে শৌখিন সব কাটগ্লাসের ও চিনেমাটির বাসনপত্র, আধুনিক কাটলারিসেট অবধি। গদিআঁটা সোফাসেট, শ্বেতমর্মরের বাহারি গোলটেবল যার পায়া এক নগ্ন নারীমূর্তি, একটি ছোটো গ্রন্থাগার। রয়েছে জগৎশেঠের ব্যবহৃত বর্তমানে শতছিন্ন পোষাক, জুতো, পাগড়ি। স্ফটিকপাথর, জল গরম করার পাত্র, নবাবি আমলের মুদ্রা, ধাতব ও পাথরের বাসনকোসন ইত্যাদি।

নশিপুর রাজবাড়ি :-

ঐতিহাসিক নশিপুর রাজবাড়িতে রয়েছে প্রচুর দেবদেবীর মূর্তি। একতলার বিশাল "L" আকৃতির দালানটির দেওয়াল জুড়ে অনেকগুলো কুলুঙ্গি। তাতে রামসীতা, হনুমান, রাধাকৃষ্ণসহ অনেক পাথরের দেবদেবী মূর্তি শোভা পাচ্ছে। মূল মন্দিরেও রয়েছে একাধিক মূর্তি। দোতলায় রয়েছে রাজপরিবারের সদস্যাদের ব্যবহৃত শাড়ি, টিনের পাতে এমবসকরা দেবদেবীর ছবি,পেতলের সব মাঝারি মাপের মূর্তি - নাড়ুগোপাল, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা ইত্যাদি। স্নানের জন্য সিমেন্টের বাথটব, বিশাল বড়ো গ্র্যান্ডফাদার ক্লক, লোহার ও কাঠের সিন্দুকসহ রাজপরিবারের ব্যবহৃত আসবাবপত্র রয়েছে।

কলিজাখাকি বেগমের সমাধি :-

কলিজাখাকি বেগম বলে কথিত আজিম-উন-নিসার সমাধিক্ষেত্রটি বেশ বড়ো এলাকা নিয়ে। প্রবেশ করতে হয় দেউড়ি পেরিয়ে। ভেতরে কেয়ারিকরা গাছ পথের দুধার দিয়ে চলে গেছে। ডানদিকে একটি লোহার শিকঘেরা আধো অন্ধকার জায়গায় বেগমের সমাধিটি, সামনে কয়েন ছড়িয়ে গেছে দর্শনার্থীরা। বেগমের মৃত্যু ঘিরে যে মিথটি প্রচলিত তা হল,মুর্শিদকুলি খাঁর এই কন্যা একবার কঠিন অসুখে আক্রান্ত হন। হেকিমরা নিদান দেন রোজ একটি শিশুর কলিজা খেলে তবেই বেগম আরোগ্যলাভ করবেন। রোজ একটি করে শিশু অপহরণ ও হত্যা করতে থাকল বেগমের গোপন অনুচররা। বেগম শিশুর কলিজা খেয়ে সুস্থ তো হয়ে উঠলেন, কিন্তু ছাড়তে পারলেন না সুস্বাদ নরমাংসের লোভ। কলিজা খাওয়া চলতে থাকল। অভিহিত হলেন কলিজাখাকি নামে। শিশু অপহরণের খবর পৌঁছলো তাঁর পিতা নবাবের কানে, ধরা পড়লেন বেগম। শাস্তি হিসেবে জীবন্ত কবরে দাফন করা হল তাঁকে। এখনো তাঁর পরিচিতি কলিজাখাকি বেগম নামেই।

মীরজাফরের বাড়ি ও নিমকহারামের দেউড়ি এবং পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র :-
ইংরেজ-আশ্রয়ী বাংলার প্রথম নবাব, সৈয়দ জাফর আলি খান অর্থাৎ মীরজাফরের বাড়িটিতে এখন পর্যটক প্রবেশ নিষেধ। ভেতরে একটি ছোটো ইমামবাড়া রয়েছে যেটি কেবল বৃহস্পতিবার খোলা থাকে। ইমামবাড়ার ভেতরে রয়েছে হজরত ইমাম হোসেনের কবরের একটি জারিহ্ যা কারবালা থেকে আনা হয়েছিল। প্রবেশপথ তথা বিশাল দেউড়ির লোহার দরজাটি খোলাই থাকে। তার নাম মীরজাফরের দেউড়ি। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের ভূমিকার পরে মানুষের মুখে মুখে এটির নাম হয়ে যায় "বিশ্বাসঘাতকের দেউড়ি"। এর অনতিদূরে রয়েছে মীরজাফরের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র। পাঁচিলঘেরা,খুব বিস্তৃত নয়। কবরগুলি সাধারণভাবে বাঁধানো, আড়ম্বরহীন। তার মধ্যে মীরজাফরের কবরটি একটু বিশেষভাবে মার্বেলের ফলক দিয়ে বাঁধানো,চিনতে অসুবিধে হয়না।

কাটরা মসজিদ :-
কাটরা মসজিদের এলাকাটি বেশ বিস্তৃত। ঢাকার করতলব খাঁ মসজিদের অনুকরণে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। মাদ্রাসা হিসেবেও ব্যবহার হত এটি। দুদিকে দুটি সুউচ্চ মিনার, নীচু নির্মাণের মাথায় অনেকগুলো গম্বুজ। ওপরের গম্বুজ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মাথার দিকটা ভেঙে গিয়েছে। মসজিদের ভেতরে দুপাশে ছোটো ছোটো নানা আকৃতির প্রকোষ্ঠ রয়েছে। সবুজ গালিচার মতো ঘাসেঢাকা চত্বর থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। সেখানে আরেকটি ছড়ানো চত্বর, ছোটো ছোটো প্রকোষ্ঠে ঘেরা। পিছনে একটি কেয়ারিকরা বিস্তৃত বাগান রয়েছে। এই মসজিদের প্রবেশ তোরণের নীচেই সমাধিস্থ রয়েছেন মসজিদনির্মাতা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি এই জীবদ্দশাতেই মসজিদ প্রাঙ্গণেই সমাধিস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে কথিত আছে।
জাহানকোষা কামান :-
লালবাগের আরেক দর্শনীয় বস্তু মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে তৈরি জাহানকোষা কামানটি বাঙালি কারিগর জনার্দনের ধাতুবিদ্যায় পারদর্শিতার নিদর্শন। সাত মিটার দীর্ঘ এই কামান বহু যুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে। জাহানকোষা শব্দের অর্থ "বিশ্বজয়ী"।
খোশবাগে নবাব পরিবারের সমাধিক্ষেত্র :-
লালবাগ দর্শনের পর্বশেষে গঙ্গার ঘাট পেরিয়ে খোশবাগে যাওয়া গেল নবাব পরিবারের সমাধিক্ষেত্রে। বেশ সাজানো গোছানো জায়গাটি। নবাব পরিবারের সদস্যদের অনেক সমাধি রয়েছে ছড়িয়েছিটিয়ে। নাতিবৃহৎ প্রবেশদেউড়িটি পেরিয়ে ভেতরে কেয়ারকরা বাগান, তার মধ্যে রয়েছে

অনেক কবর। এর মাঝেই রয়েছে নবাবের বিশ্বস্ত গোলাম হোসেনের কবর। ডানপাশে নতুন করে ঘিরে দেয়া হচ্ছে অনেক কবরের জায়গা। সেটি পেরিয়ে নীচু পাঁচিলঘেরা বাঁধানো চত্বরটিতে শায়িত নবাব পরিবারের সদস্যারা। সিরাজজননী আমিনা বেগম, খালাআম্মা ঘসেটি বেগমের কবর দুটি পাশাপাশি, এছাড়া আরো কয়েকটি কবর রয়েছে। চত্বরটি পেরিয়ে একটি মর্মরে বাঁধানো দালান, তার একেবারে মধ্যস্থলে উঁচু উঁচু তিনটি ধাপসংবলিত কবরে শায়িত নবাব আলীবর্দি খাঁ। বাঁদিকেই অপেক্ষাকৃত নীচু অনাড়ম্বর কবরে শায়িত তাঁর আদরের নাতি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। মাথার কাছে একটি মার্বেল ফলক, আরবী হরফে লেখা, সেইটি দেখেই চিনে নেয়া যায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার কবরটি। তাঁর কবরের বামপাশে বেগম লুৎফ-তুন-নিসার কবর। বাবা-মায়ের পায়ের দিকের কবরটি কন্যা জহরৎ-উন নিসার। দালানটি পেরিয়ে একটি মসজিদ রয়েছে।

ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র :-

কাশিমবাজার ছোটো রাজবাড়ি যাওয়ার পথের ধারেই রয়েছে ওলন্দাজদের সমাধিক্ষেত্র। অনতিদূরে কল্কাপুর নামে স্থানে ছিল ওলন্দাজদের কারখানা। কারখানাটি নষ্ট হয়ে গেলেও রয়েছে ওলন্দাজদের সমাধিক্ষেত্রটি। সব মিলিয়ে তেতাল্লিশটি কবর রয়েছে এই সমাধিক্ষেত্রে। লালচে রঙের সমাধিগুলি কোনো কোনোটি সুউচ্চ ও চূড়াকৃতি,কোনোটি গোল গম্বুজাকৃতির,দ্বিতলসম উচ্চতা,নীচে রয়েছে একাধিক আর্চসহ খোলা চত্বর,কোনোটি সাধারণভাবে বাঁধানো। অনেকগুলো সমাধির গায়ে প্রাচীনতার ছাপ, শ্যাওলার দাগ,ক্ষয়ের চিহ্ন,সংস্কারের কাজ চলছে কোনো কোনোটির। একটি সমাধি বিশাল গম্বুজাকার,সাদা,সুন্দর কারুকাজ করা থাম,সম্ভবত কোনো উচ্চ পদাধিকারীর সমাধি হবে সেটা। ভেতরে রয়েছে যত্নে সাজানো ফুলের বাগান, ঘাসেঢাকা জমি। কোথাও কবরের ধারে বসে আড্ডা জমিয়েছে তরুণদের দল।

কাশিমবাজার ছোটো রাজবাড়ি :-

কাশিমবাজার ছোটো রাজবাড়ির পরিধি সুবিশাল। এটি বেশ জনপ্রিয় ভ্রমণস্থান,কিন্তু সেদিন এখানে লোকসমাগম বেশ কম। রাজবাড়ির ভবনটি তালাবন্ধই থাকে,একজন কর্মচারীকে ডেকে এনে চাবি দেওয়া হল। তালা খুলে সেই প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাই আমাদের রাজবাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন। এটাসেটা বলে দিচ্ছিলেন,গাইডের মত। এখানে কোনো গাইডের উৎপাত দেখা গেল না, নিরাপত্তাব্যবস্থারো কোনোরকম বাড়াবাড়িও নয়। অপর কোনো দর্শনার্থী চোখে পড়ল না।

এই ঐতিহাসিক রাজবাড়িটির পত্তন করেন দীনবন্ধু রায়। এঁদের আদি পদবী ছিল চট্টোপাধ্যায়। রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে বেদপাঠের জন্য যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসেছিলেন, দক্ষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই দক্ষের বংশের বাইশতম বংশধর ছিলেন দীনবন্ধুর পিতা অযোধ্যারাম রায়। অযোধ্যারাম তাঁর অসামান্য মেধার জন্য নবাব নাজিমের নিকট হতে রায় খেতাব লাভ করেন। দীনবন্ধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজার রেশমকুঠির দেওয়ান ছিলেন। তিনিও নবাব সরকারের কাছ থেকে খেলাত ও রৌপ্যমণ্ডিত ছড়ি ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিলেন। এখন এঁদের উত্তরসূরীরা কলকাতায় থাকেন, উৎসব-পার্বণে একত্রিত হন এখানে।

রাজবাড়ির বাইরেটা খুব সুন্দর এবং সযত্নরক্ষিত। বিশাল গেট এবং দেউড়ি পার করে সুবিশাল ঘাসেঢাকা উঠোন। ঠিক মাঝখানে গোল এলাকা নিয়ে বাহারি চেন দিয়ে ঘেরা কেয়ারিকরা সব ঝোপের মতো গাছ। মাঝে মাঝে বিশাল দেবদারু। ঢুকে বাঁদিকে রয়েছে প্রশস্ত শ্বেতমর্মরে বাঁধানো চত্বর। চারদিকে বেশকিছু জোড়া থামের মাথায় বাহারি ফুলের টব। সামনের থামের মাথায় বাতিস্তম্ভ। মাঝখানে পাঁচটি ছোটো স্তরবিশিষ্ট ফোয়ারা। এছাড়া বিশাল আঙিনার চৌহদ্দি জুড়ে ছড়ানো রয়েছে বাতিস্তম্ভ, শ্বেতমর্মর মূর্তি, দুষ্প্রাপ্য সব গাছপালা। ডানদিকে প্রাসাদের চূড়াকৃতি মিনারের গায়ে রয়েছে বিশাল ঘড়ি। মুখে মুখে এটির নাম ঘড়িঘর। উঠোনের হাতার মধ্যেই রয়েছে শিবমন্দির,চারধারে চারটি ছোটো এবং মাঝখানে একটি চূড়াবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দিরটি শ্বেতশুভ্র,ভেতরে শিবলিঙ্গ রয়েছে। প্রাসাদের মূল প্রবেশদ্বারের ওপরে রয়েছে গাঢ় সবুজ রঙের ওপরে সোনালি রঙের দুটি সিংহের মনোগ্রাম।

রাজবাড়ির ভেতরে ঢোকার আগেই চলে গেলাম পেছনদিকটায়, বিশাল দিঘি মজে আছে,গরুও চরছে ভেতরে। ছোটো একটি জলের ডোবার মতো অবশ্য আছে - ঘন শ্যাওলায় ঢাকা,স্মৃতির মতই। বাঁধানো ঘাটের জাঁকজমক একসময়ে দেখার মতোই ছিল বোঝা যায়। ধাপে ধাপে চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে অনেকটা গভীরে। ওপরে ঘাটের দুধারে কারুকাজ করা প্রশস্ত সুন্দর বিশ্রম্ভালাপের জায়গা রয়েছে। দিঘির পাড়েই রয়েছে বিশাল প্রাচীন নাগকেশর গাছ, প্রচুর ফুল ফুটে আছে, গাঢ় গোলাপি রঙের পাপড়ির ভেতরে সোনালি গর্ভমুণ্ড।

রাজবাড়ির অভ্যন্তরের ঘেরা চত্বরে চারটি করে মোট ষোলোটি থাম রয়েছে চার পংক্তিতে, অতি সুন্দর দেখতে। তার তিনদিক ঘিরে মূল প্রাসাদ, শ্বেতশুভ্র, বাহারি সিঁড়ি উঠে গেছে দুদিক দিয়ে। বারান্দার ওপরে রয়েছে মিহি কারুকাজ, জাফরিকাটা। চিক দিয়ে ঘেরা বারান্দার উপরিভাগ।

দরবার কক্ষটির আভিজাত্য খুবই নয়নাভিরাম। দ্বিতল দরবারটি লম্বাটে ও ছড়ানো, দুধারে মোটা থামযুক্ত আর্চ রয়েছে। রয়েছে শ্বেতমর্মরের আধারের ওপর সুন্দর সব ভারি বিশাল রঙিন পাথরের ফুলদানি। দরবারেরই একধারে রয়েছে বৈঠকখানা। ভারি কাঠের মোট ষোলোটি গদিআঁটা আধুনিক ধাঁচের চেয়ারসহ বিশাল টেবিল, পায়ায় সুন্দর কারুকাজ, সব সাদা কাপড় এবং মোটা পলিথিন দিয়ে ঢাকা। অনেকগুলো পায়রা সেখানে বাস করছে দেখা গেল।

এই রাজবংশের গৃহদেবতা মদনগোপাল। ভেতরে রয়েছে তাঁর মন্দির। কাশিমবাজার রাজবাড়ির পুজোপার্বণ এবং অতিথি আপ্যায়নের ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ। দালানের ভেতরে রয়েছে বালগোপালের বিশাল মূর্তি। ঘনশ্যাম বর্ণের শিশু গোপাল হাঁড়ি থেকে ননী খেতে ব্যস্ত, হাতমুখে ননী মাখামাখি। একটি কাঁচের বাক্সের মত আবরণের মধ্যে মূর্তিটি বসানো, সম্ভবত সুরক্ষার কারণে।

ভেতরের উঠোনের মাঝখানে বাঁধানো তুলসীমঞ্চ, ওধারে লম্বা দালানে সিঁদুরের স্বস্তিশোভিত বিশালাকৃতির বাটনাবাটা শিলনোড়া, বিশাল চন্দনপাটা, পুজোর প্রচুর বাসনকোসন ইত্যাদি রয়েছে। প্রত্যহ মদনগোপালের সেবার পর এই লম্বা দালানটিতে বিখ্যাত পংক্তিভোজনের পাত পড়ত, প্রচুর লোকসমাগম হত। একটি বোর্ড দিয়ে দালানটির গায়ে পংক্তিভোজনের দালান বলে লেখা আছে। ভেতরের প্রশস্তঘরটিতে ভোগের রান্নাবান্না হত। এখন সেখানে আসন্ন কার্তিকপুজোর আয়োজন চলছে,মূর্তি গড়া হচ্ছে।

কাশিমবাজার ছোটো রাজবাড়ির দুর্গাপুজো এতদঞ্চলে বিখ্যাত। ঠাকুরদালানটি বেশ বড়ো। বিশাল চত্বরের চারদি মোটা মোটা কারুকাজকরা থামে ঘেরা। ঠিক মাঝখানটিতে সাদাকালো চৌখুপির ওপর বসানো পেল্লায় পেতলের ঘট,পেতলের ডাবসহ। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মূল ঠাকুরদালান। বারান্দার দুধারে দাঁড়ে বসানো দুটি নকল শুকসারি। লাল এবং নীল রঙের। দুর্গামূর্তি যেখানে রাখা হয় তার মাথায় চাঁদোয়া টাঙানো,সাদার মধ্যে লাল নীল হলুদ রঙের সূতো দিয়ে অপরূপ কারুকাজকরা,চারধারে ঝোলানো ঝালর। পেতলের বিশাল প্রদীপ রয়েছে, নিত্য সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয়।

সংগ্রহশালার ভেতরটা ঠাসা পুরনো আমলের জিনিসপত্রে। রঙবেরঙের বেলোয়ারি কাঁচ লাগানো পালকি রয়েছে, এতে করে নাকি রানিরা যাতায়াত করতেন। রাজবংশের লোকেরা বেশ শৌখিন ছিলেন বোঝা যায়,কার র‍্যালিতে অংশ নিতেন, বিজয়ীর স্মারকসম্মান সাজানো রয়েছে। রাজবংশের এক দম্পতির বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কবিকে ফরমায়েশ করে লেখানো কবিতা দম্পতির ছবিসহ বাঁধানো রয়েছে, দেওয়ালে টাঙানো। বারান্দায় ওপর থেকে নীচ অবধি লম্বা রঙিন পট টাঙানো, অনেকটা কালীঘাটের পটের আদলে। তাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিভিন্ন ঘটনা চিত্রিত রয়েছে। খাবার ঘরটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। জমকালো ভারি কাজের কাঠের চেয়ার টেবিল, স্কাইলাইট দিয়ে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, ওপরে ঝোলানো পাখাগুলোর গায়েই চারটে করে ছোটো শেডের মধ্যে আলো ঝোলানো রয়েছে। ওপর থেকে ঝালর লাগানো হাতে টানা পাখাও রয়েছে, ছাদের এধার থেকে ওধার অবধি।

এছাড়া রয়েছে বিশাল ভারি কাঠের কাজের ছত্রি লাগানো পালঙ্ক, সোফা, চেয়ার টেবিল, পুরনো আমলের ড্রেসিং টেবল। রয়েছে রূপাবাঁধানো গড়গড়া, আলনায় সূক্ষ্ম কাজের সব ভারীভারী শাড়ি, কোট ও টুপি রাখবার স্ট্যাণ্ড, দেয়ালে হাতেআঁকা সুন্দর সব ছবি, কাঠের হরিণের শিংওলা মাথা, ডোকরার মানুষ মডেল ফ্রেমে বাঁধানো, কাঠের ভারী ছোটো সিন্দুক,সাজানোগোছানো কাছারিঘরে রয়েছে চেয়ার টেবিল থেকে পুরনো আমলের ক্যাশবাক্স অবধি। চানঘরে রাখা আছে বিশাল বাথটব। রয়েছে চিনেমাটির পুরনো জলের ফিল্টার, বিলিতি কোম্পানির নামখোদাই করা। রয়েছে বিশাল দাবার বোর্ড, তার ঘুঁটিগুলো সব ইয়াব্বড়ো একেকখানা হাতি ঘোড়া মানুষ। রয়েছে নাচঘরও, সেখানে ফরাস পাতাও আছে, শুধু নাচ এখন স্মৃতি।

মালদহ (গৌড়) :-
বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় ইতিহাসসমৃদ্ধ বহু স্থাপত্যে ভরপুর। যাবার আগে অনেকেই নিরুৎসাহিত করেছিলেন, শুধু কিছু ভাঙাচোরা ইট, ঘুরে এসে আফসোস ছাড়া কিছুই হবেনা ইত্যাদি, কিন্তু ওই ভাঙা ইটগুলোর মধ্যে অতীতের গন্ধ খুঁজতেই তো পাড়ি দেওয়া!
মদনমোহন মন্দির :-
প্রথমেই যাওয়া গেল গৌড়ের প্রসিদ্ধ মদনমোহন মন্দিরে। এখানের মেলা খুব বিখ্যাত, মেলার সময় প্রচুর জনসমাগম হয় দেশবিদেশ থেকে। মদনমোহনের মন্দির বেশ কারুকাজ করা,সামনে নাটমন্দির,বাইরে শ্রীচৈতন্যের বিশাল উদ্বাহু মূর্তি আর প্রাচীন কদমগাছ, নাম কেলিকদম্ব। ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্য এই স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং এই গাছের ছায়ায় বসে ভক্তদের উপদেশ বিতরণ ও নামগান করেছিলেন। সেই থেকেই এই গাছটি বিশেষ হয়ে উঠেছে ভক্তদের চোখে।

বড়োসোনা মসজিদ (বারদুয়ারি) :-
এরপরের দ্রষ্টব্য বড়োসোনা মসজিদ। বিশাল এলাকা নিয়ে মসজিদটির অবস্থান। নির্মাণকাল ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ, সুলতান নসরত খাঁ-এর আমলে নির্মিত। এর আরেকটি নাম বারোদুয়ারি যা লোকমুখে বারদোয়ারি বলে প্রচলিত, কারণ এই মসজিদটির মোট বারোটি দরজা বা দুয়ার ছিল, বর্তমানে যদিও এগারোটি দরজাই পরিলক্ষিত হয়। মসজিদটির চারধারের বারান্দায় কারুকার্যময় খিলানের উপস্থিতি, ভেতরের তিন খিলানের ওপরের গম্বুজটি এখন আর নেই। এই গম্বুজটির সোনালি চিকণ কারুকার্যের জন্যই মসজিদের নাম হয়েছি বড়োসোনা মসজিদ। এর উত্তর দিকে মহিলাদের জন্য পৃথক একটি প্রকোষ্ঠ ছিল, দক্ষিণপূর্বে মুয়াজ্জিনের আজান দেওয়ার প্রকোষ্ঠ, দুটোই এখন ধ্বংসাবশেষ। তিনটি তোরণের মধ্যে একটিই কেবল অক্ষত। বড়োসড়ো ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ইতস্তত পড়ে থাকা খিলানগুলির কারুকাজ চোখ টানবে।
সেলামি দরওয়াজা :-
পরবর্তী দ্রষ্টব্য দাখিল বা সেলামি দরওয়াজা। সুলতান বারবক শাহের আমলে এটি নির্মিত, নির্মাণকাল ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দ। এটি গৌড় দুর্গের উত্তরদিকের প্রধান প্রবেশপথ ছিল। এখান থেকে কামানের গোলাবর্ষণ করে সম্মান জানানো হত বলে এর নাম সেলামি দরওয়াজা। এই স্থাপত্যটিতেও রয়েছে থাম, দেওয়ালে ও খিলানে চমৎকার সব কারুকাজ।
ফিরোজ মিনার :-
এরপর ফিরোজ মিনার। এটির নির্মাণকাল আনুমানিক ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ,নির্মাতা সঈফ উদ্দিন ফিরোজ,হাবশী এই সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান বারবক শাহকে হত্যা করে। প্রায় ছাব্বিশ মিটার উচ্চতা এই মিনারের। ভেতরে রয়েছে মোট তিয়াত্তরটি সোপান। মিনারের অভ্যন্তরে অবশ্য প্রবেশ নিষেধ। সামনে একটি পুকুর রয়েছে।

কদম রসুল মসজিদ :-

পরবর্তী দ্রষ্টব্য কদম রসুল মসজিদ। এটিও সুলতান নসরত শাহের আমলে নির্মিত। নির্মাণকাল ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ। নবী মোহাম্মদের পায়ের চিহ্নসংবলিত একটি পাথর এই স্থানে রক্ষিত ছিল, এই কারণেই নামকরণ কদম রসুল মসজিদ। চতুষ্কোণ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির পশ্চাৎভাগে একটি ছোটো কবরস্থান রয়েছে। মূল মসজিদের প্রবেশদ্বারের পাশেই একটি আরবী লিপিফলক, সেটি খোদ মদিনা থেকে আনা হয়েছে বলে কথিত। ভেতরে নাতিপ্রশস্ত চাতাল, মসজিদগৃহের চারধারের বারান্দা পেরিয়ে পদচিহ্নের পাথর রাখার ঘরটি। এখানেই রয়েছে মোঘল সম্রাট অওরঙ্গজেবের সেনাপতি দিল্ওয়ার খাঁ-এর পুত্র ফতেহ্ খাঁ-এর সমাধি। কথিত আছে, সুলতান সুজাকে বিদ্রোহ করার পরামর্শ দেবার অপরাধে পীর শাহ্ নিয়ামত্উল্লাহকে হত্যা করার জন্য সম্রাট ফতেহ্ খাঁকে পাঠান, গৌড়ে পৌঁছে ফতেহ্ খাঁ এই স্থানেই রক্তবমন করে মারা যান। সমাধিগৃহটি উত্তল ছাদবিশিষ্ট শৈলীতে তৈরি।

চিকা /চামকান মসজিদ :-

এরপরের গন্তব্য অদূরের চিকা বা চামকান মসজিদ,নির্মাণকাল ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ। এককালে এর ভিতরে বহু চামচিকার বাস থাকায় নাম হয়েছে চিকা মসজিদ। এক গম্বুবিশিষ্ট এই গৃহটিকে মসজিদ বলা হলেও, কথিত আছে এটি সুলতান হুসেন শাহের আমলে কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হত। হিন্দু মন্দির থেকে আনীত বহু কারুকাসংবলিত পাথর এটির নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হয়। মূল গৃহটির বাঁদিকে অদূরেই রয়েছে এক গম্বুজবিশিষ্ট নাতিবৃহৎ কারাগারগৃহটি। একটি খিলানে কাজকরা পাথরের থাম রয়েছে সামনেই, তাতে ফুল পাতা, মানুষের অবয়বসহ অসাধারণ সূক্ষ্ম সব কারুকার্য খচিত আছে। গৃহটিতে পরিলক্ষিত হয় সুন্দর সব রঙিন মিনাকারী পাথরের কারুকাজ, গোল পাতলা প্রাচীন ইটের ব্যবহার, থাম ও দেওয়ালের নয়নলোভন সৌন্দর্য। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।

লুকোচুরি দরওয়াজা :-
অদূরেই রয়েছে লুকোচুরি দরওয়াজা। নির্মাণকাল ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ, নির্মাতা শাহ্ সুজা। এটি গৌড় দুর্গের পূর্ব দিকের প্রধান দরজারূপে ব্যবহৃত হত। উপরিভাগ ব্যবহৃত হ নহবতখানা হিসেবে। এছাড়া কথিত আছে দ্বিতল,বহু ছোটো প্রকোষ্ঠ সংবলিত এই স্থানটিতে নবাব তাঁর বেগমদের নিয়ে লুকোচুরি খেলতেন।
লোটন মসজিদ :-
পরবর্তী গন্তব্য লোটন মসজিদ। নির্মাণকাল ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ,নির্মাতা শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্। এই মসজিদকে ঘিরে অনেক কথাকাহিনি প্রচলিত বলে শোনা গেল। একগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির নির্মাণশৈলী অসাধারণ। এর দেওয়াল, থাম, খিলান, ভেতরের গম্বুজমধ্যস্থ চিকণ সব কারুকার্য এক কথায় অনন্য। দেওয়ালের বাইরের প্রকোষ্ঠগুলির সূক্ষ্ম ফুল পাতা লতার কারুকাজ, রঙিন মিনাকারির পুরনো সব পাতলা গোল ইটের কাজ, থামের অঙ্গসজ্জা পুরোটাই নয়নাভিরাম। বৃহস্পতিবার ছাড়া বাকি দিনে ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
অজানা মণিমুক্তো :-
সবশেষে পথিপার্শ্বে দুটি মসজিদ দেখা হল যাদের নাম পরিচয় জানা গেল না। একটি মসজিদের সামনের প্রশস্ত চত্বরে দুটি কালো পাথরে বাঁধানো কবর রয়েছে, রেলিংঘেরা। মূল মসজিদটির ছাদ সম্পূর্ণ ভাঙা, মোট তিনটি গম্বুজ ছিল সে আভাস স্পষ্ট, চারটি কারুকাজকরা থাম দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের দেয়ালে সূক্ষ্ম ফুল পাতার কাজ রয়েছে। ভিতরে মাঝারি আকারের দেয়াল প্রকোষ্ঠ রয়েছে,এখনো তার সৌন্দর্য অটুট। পাশেই লাগোয়া একটি মৌচাক, মৌমাছির অবাধ যাতায়াত ভিতরে। দুটি মসজিদের হালই মোটামুটি একরকম।

গঙ্গার ঘাট :-
এছাড়া ইতিউতি ছড়িয়ে গঙ্গার ঘাট রয়েছে অনেকগুলো। সন্ধ্যের মুখে বাঁধানো সিঁড়িতে গিয়ে বসলে সূর্যাস্তের মোহন রঙ চোখ জুড়িয়ে দেবে। দুএকটি ঘাটে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে খোলা চত্বরে বসে নদীর সৌন্দর্য দেখার ব্যবস্থাও রয়েছে।

বিশেষত্ব :-
সংগ্রহে রাখা যেতে পারে মুর্শিদাবাদ সিল্ক, খাগড়ার সুবিখ্যাত কাঁসার বাসন। আর চাখতে ভুল করলে চলবেনা লালবাগের প্রসিদ্ধ ছানাবড়া ও পোস্তদানাদছড়ানো ক্ষীরকদম। মুর্শিদাবাদে গ্রামের মাটির গন্ধমাখা আলকাপ গানের আসর বসে বিভিন্ন জায়গায়, মূলত বিশ্বকর্মা পুজো থেকে কার্তিকপুজো অবধি। তবে গ্রামের দিকে গেলে গান শুনে আসা যাবে সবসময়েই।

~ *মুর্শিদাবাদের আরও ছবি ~ গৌড়ের আরও ছবি ~*

শীলা চক্রবর্তীর জন্ম বাংলাদেশের খুলনায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতক। মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যানলয় থেকে অপরাধ আইনে স্নাতকোত্তর। প্রয়াগ এলাহাবাদ সঙ্গীত একাডেমি থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতে স্নাতক। পেশায় আইনজীবী। ভালবাসার জায়গা গান, কবিতা, নাটক, লেখালিখি। বেড়াতে ভালবাসেন। দীর্ঘদিন ধরে লেখালিখির যুক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়।

---

tell a Friend

সপ্তাহ-অন্তের ভ্রমণে বাংলার পোড়ামাটির মন্দির

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

সকাল সকাল বের হওয়া প্রয়োজন, তা না হলে অসুবিধায় পড়তে হবে। সূর্যদেব যত মাথার উপরে উঠবেন তত গরম বাড়বে। সেই অবস্থায় বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হবে না। আমাদের গন্তব্য বাঁকুড়ার সোনামুখী। আর সম্ভব হলে ফাউ হিসাবে হদল নারায়ণপুর। উদ্দেশ্য কয়েকটি পোড়ামাটির মন্দির দেখা।

মোটর সাইকেল যোগে বর্ধমান থেকে রওনা হয়েছিলাম সোনামুখীর উদ্দেশ্যে। দামোদর নদের .সতু পার হয়ে বর্ধমানের দক্ষিণে কিছুটা এসে বাঁকুড়া মোড় থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা যেতেই মালুম হল এযাত্রায় আমাদের জন্য কী চমক অপেক্ষা করছে! সরকার বাহাদুরের কল্যাণে সোনামুখীর রাস্তা সংস্কারের কাজ চলেছে। রাস্তার ছালচামড়া তোলা হয়েছে। সুতরাং সারা পথটি নাচতে নাচতে, দেহের ওপরে কয়েক মিলিমিটার ধুলোর আস্তরণ চাপিয়ে, ডবল সময় নিয়ে সোনামুখী যখন পৌঁছালাম তখন ধুলোয় সজ্জা নেওয়াটাই শ্রেয় মনে হল।

গ্রাম বাংলায় বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অংশের জেলাগুলিতে অজস্র ইটের মন্দির রয়েছে। সেগুলির বেশ কিছু মন্দির টেরাকোটা ফলক দ্বারা অলংকৃত। এই টেরাকোটা ফলকগুলি আটকানো রয়েছে মন্দিরগাত্রে। অলংকরণের বিষয়বস্তুও নানা ধরণের। আমার আকর্ষণ এই ফলকগুলি। তাই অতি সংক্ষেপে এই বিষয়ে দু-চার কথা বলে নিই।

টেরাকোটা ফলকগুলির বিষয়বস্তু যে নানা ধরণের সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতি সংক্ষেপে সে কথা জানাই-

• হিন্দু দেবদেবী -
অলংকৃত সব মন্দিরেই বেশ কিছু ফলক রয়েছে হিন্দুদের দেবদেবীর। ফলক রয়েছে নারায়ণ, দেবাদিদেব মহাদেব, মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, কালী, ব্রহ্মা, ইত্যাদি দেবদেবীগণের। এদের মধ্যে বিষ্ণু, শিব এবং মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার ফলক দেখতে পাওয়া যায় সর্বাধিক। অল্প কিছু মন্দিরে রয়েছে অন্নপূর্ণা, কমলে কামিনী বা দেবরাজ ইন্দ্রের ফলক।

• পৌরাণিক কাহিনি-
শিল্পীরা ফলকে চিত্রিত করেছেন বেশ কিছু পৌরাণিক কাহিনি, যেমন সমুদ্রমন্থন, গঙ্গার মর্ত্যে আগমন, পারিজাত বৃক্ষের দখল নিয়ে ইন্দ্র এবং কৃষ্ণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মার পরাজয়স্বীকার ইত্যাদি। এটা মনে রাখা প্রয়োজন পৌরাণিক কাহিনির ফলক অল্প কিছু মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়।

• রামায়ণ কাহিনি-
কোন না কোন রামায়ণ কাহিনির ফলক প্রায় সব অলংকৃত মন্দিরে দেখা যায়। যে ফলকটি সব চেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় সেটি হল রাম - দশাননের যুদ্ধ। অনেক মন্দিরের প্রবেশ পথের খিলানের উপর বড় প্যানেলে লংকা যুদ্ধের ফলকটি স্থান পেয়েছে।

• মহাভারতের গল্প -
পোড়ামাটির মন্দিরগাত্র অলংকরণে রামায়ণ কাহিনির ফলক যে পরিমাণে দেখা যায়, তুলনায় মহাভারতের কাহিনির চিত্রণ বেশ অল্প। এর কারণ সঠিকভাবে বোঝা যায় না। সব মিলিয়ে সাত-আট ধরণের ফলকের সন্ধান মেলে। এর মধ্যে ভীষ্মের শরসজ্জা এবং অর্জুনের লক্ষ্যভেদের ফলক একাধিক মন্দিরে রয়েছে।

• শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনি -
রামায়ণের কাহিনির মত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনার চিত্রণ অতি জনপ্রিয়। অলংকৃত সব মন্দিরেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনির বিভিন্ন ফলক তাই দেখতে পাওয়া যায়।

• আর্থসামাজিক চিত্র -
বিভিন্ন ধরণের আর্থসামাজিক বিষয়ের ফলক স্থান পেয়েছে মন্দির অলংকরণে। এই জাতীয় ফলকগুলি দেখতে পাওয়া যায় মন্দিরের একেবারে নীচে বেসপ্লেট বা বেস ফলক স্তরে। সমাজচিত্রের যে যে বিষয়গুলি বেশি দেখা যায় সেগুলি হল - ক) রাজপুরুষ বা জমিদারদের শিকার যাত্রা, খ) রাজপুরুষ বা ধনীব্যক্তির শোভাযাত্রা সহকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন, গ) যানবাহন (পালকি, নৌকা ইত্যাদি), ঘ) বিদেশী/ইউরোপীয়দের ফলক, ঙ) বাবুদের অবসর যাপন, চ) সঙ্গীত চর্চা এবং বাদ্যযন্ত্র, ছ) প্রসাধনরতা নারী, জ) সাধু, ঝ) মিথুন ইত্যাদি।

• মাঙ্গলিক চিহ্ন - প্রায় সব পোড়ামাটির মন্দিরে কিছু না কিছু ধরণের মাঙ্গলিক চিহ্নের ফলক দেখতে পাওয়া যায়। বহু মন্দিরের প্রবেশ পথের

উপরে পদ্মের ফলক রয়েছে। হিন্দু দেবদেবীদের অনেকেই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসে রয়েছেন। তাঁদের কারো কারো হাতে রয়েছে পদ্ম। সহস্রদল পদ্মকে সাধনার শেষ সোপান বা সহস্রারের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

• নক্সা, ফুল, লতাপাতা, প্রাণী, ইত্যাদি -
লতাপাতা, ফুল, প্রাণী বা নক্সার ফলক অল্পবিস্তর সব মন্দিরেই রয়েছে।
মন্দিরের এক একটি জায়গায় যে জাতীয় (বিষয়) ফলক লাগানো হয় সেগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এক একটি স্থানের ফলকের মাপের তফাৎ রয়েছে। মন্দির প্রবেশ পথের খিলানের উপরের প্যানেলে যে ধরণের ফলক ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে মন্দিরের সর্বনিম্নের ফলকগুলি (বেস প্লেটের) বা কার্ণিসের ঠিক নীচের স্তরের ফলকের মাপ বা চরিত্র আলাদা। একটি মন্দিরের যে সব স্থানে টেরাকোটা ফলক লাগানো হয় সেগুলি হল - ক) প্রবেশ পথ, খ) প্রবেশ পথের খিলানের উপরের প্যানেল, গ) কার্ণিসের নীচের স্তর, ঘ) মন্দিরের ওপর দিকে দুই কোণ, ঙ) পাশের দেওয়াল, চ) স্তম্ভ এবং ছ) সর্ব নিম্নের বেসপ্লেট গুলিতে।

প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় সোনামুখী পৌঁছে ওখানের বাজার পাড়ায় পঞ্চবিংশতিরত্ন শ্রীধর মন্দিরের সন্ধান মিলল। মন্দিরের সামনে হাজির হয়ে বুঝলাম মন্দিরটির চারদিকই সুন্দর সুন্দর ফলকের সাহায্যে অলংকৃত। তবে মন্দিরের দুটি দিক আমরা দেখতে পাব। একদিকে প্রাচীর তোলা হয়েছে সুতরাং সেইদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। আর পিছনের দিকে রয়েছে একটি বাগান। সেটির গেট তালাবন্ধ।

গর্ভগৃহে প্রবেশপথের খিলানের উপরে একটি বড় প্যানেলের দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টি সেখানেই আটকে গেল - শিবঠাকুর হিমালয়নন্দিনী পার্বতীকে বিয়ে করতে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অপর দুটি মন্দিরের একই জাতীয় ফলকের কথা। একটি মন্দির কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটের বাগটিকরায়। আর অপরটি বীরভূমের মল্লারপুরের কাছে গণপুর গ্রামে। এই দুটি মন্দিরের ফলকে একই জাতীয় বিষয় চিত্রিত করা হয়েছে - শিবঠাকুর বিয়ে করতে চলেছেন।

গণপুর গ্রামের মাঝখানে কালীমন্দির চত্বরে যে মন্দিরগুচ্ছ রয়েছে, সেই মন্দিরগুলির একটি শিবমন্দিরে পাশাপাশি দুটি ফলকের একটিতে, শিবের অনুচর এবং সঙ্গী বাঁ হাতে ত্রিশূল এবং ডান হাতে আলো ধরে প্রভুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শিব-অনুচরের মুখটি পশুর ন্যায়। মাথায় মুকুট। বাঙালি কবিদের কল্পনায় শিবের সহযাত্রীরা সব ভূতের দল।

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত পৌরাণিক অভিধানে শিবের প্রিয় অনুচর ভৃঙ্গী বিষয়ে লিখেছেন, ভৃঙ্গী একবার শিবানীর বিরাগভাজন হয়ে বানর-মুখ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শিবের অপর অনুচর নন্দী। ইনি বামন, করালদর্শন, ক্ষুদ্রবাহু এবং মহাবল। গণপুর গ্রামের মন্দিরে শিবের অনুচরের ফলকটিতে অনুচরের মুখটি শিল্পীর দৃষ্টিতে বানরের ন্যায়। তাই এই ফলকটি ভৃঙ্গীর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

পাশের ফলকটিতে জটাধারী শিবঠাকুর বৃষপৃষ্ঠে বসে আনন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছেন। শিবঠাকুরের বাহনটিও বেশ সাজগোজ করেছেন। উনিও ল্যাজ তুলে ছুটে চলেছেন দেবাদিদেবকে নিয়ে।

এবার চলে আসি সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের ফলকটিতে। শিবঠাকুর হাজির হয়েছেন হিমালয়-গৃহে বিবাহের উদ্দেশ্যে। ওনার সঙ্গে বরযাত্রী হিসাবে এসেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদসহ আরও কেউ কেউ। শিব ঠাকুরের পাশে কন্যাকে আনা হয়েছে পিঁড়িতে বসিয়ে। দুজন ব্যক্তি পিঁড়িটি ধরে রয়েছে। মাটিতে বসে রয়েছেন পুরোহিত।

শিব ঠাকুর সাজগোজ করেছেন, তবে তিনি নগ্ন। আর নগ্ন হবু জামাইকে দেখে কন্যার মাতা মেনকা হাতের তালুর সাহায্যে মুখ ঢেকেছেন লজ্জায়। শিব ঠাকুরের এমন দশা করেছেন স্বয়ং নারায়ণ। তিনি রঙ্গরসিকতা করতে পিছপা হননি। গরুড়কে লেলিয়ে দিয়েছেন। আর গরুড়কে দেখে বিষধরেরা ভয়ে পালিয়েছে। খসে পড়েছে শিব-দেহের বসন বাঘছাল। শিবঠাকুর নিরাবরণ হয়েছেন। ভারতচন্দ্র সুন্দরভাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন -

গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিলা গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া।।
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হইল হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর।।

দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলিতে শত শত ইটের তৈরি মন্দিরে এমন সব অনন্যসাধারণ ফলক রয়েছে। খেদের বিষয় এই যে নাম-না-জানা বাঙালি শিল্পীদের এই সব অসাধারণ শিল্পকীর্তি দেখতে আমরা ভুলে যাই। বাঙালিরা কখনও কখনও এসব মন্দিরে দেবদর্শনে যান, কিন্তু মন্দিরগাত্রের সুন্দর সুন্দর ফলকগুলি তাঁরা দেখেন না। অথচ কী নেই এই সব ফলকগুলিতে - দেবদেবী, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি, সামাজিক জীবন আরো কত কী! এই সব ফলকগুলি দেখালে যে কোন শিশুই রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনি শিখে যাবে। তাকে আর বই পড়ানোর দরকার হবে না।

সপ্তাহ-অন্তের ভ্রমণে অতি সহজেই বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরদর্শন স্থান পেতে পারে। গ্রামের কর্মহীন যুবকেরা একটু সচেষ্ট হয়ে মন্দির বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ভ্রমণার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। ফলে সৃষ্টি হতে পারে হেরিটেজ ট্যুরিজম। সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান। গ্রামের সাধারণ মানুষ গাইড হিসাবে কাজ করতে পারেন, ভ্রমণার্থীদের জন্য তৈরি হতে পারে খাবারের দোকান। এতে দুই পক্ষেরই সুবিধা হবে।

শেষে এক ডজন জায়গার (এবং মন্দিরের নাম) একটি তালিকা দেওয়া হল। এই স্থানগুলিতে রয়েছে এক বা একাধিক অতি সুন্দর মন্দির। এই মন্দিরগুলি দেখে যে কেউ সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতা ফিরে আসতে পারবেন। এগুলির মধ্যে একমাত্র বড় নগর (মুর্শিদাবাদ) কিছুটা দূরের। এই তালিকায় বিষ্ণুপুরকে রাখা হয়নি। কারণ বিষ্ণুপুরের নাম সকলের জানা।

১) একরত্ন অনন্তবাসুদেব মন্দির, বাঁশবেড়িয়া
ট্রেনে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল। ওখান থেকে বাসে বাঁশবেড়িয়া।
২) একরত্ন শ্রীরামচন্দ্র মন্দির, গুপ্তিপাড়া
ট্রেনে হাওড়া/ ব্যান্ডেল থেকে গুপ্তিপাড়া। স্টেশন থেকে অটো বা টোটোয় কিম্বা রিক্সায় মন্দির।
৩) কালনার মন্দিররাজি
ট্রেনে হাওড়া/ ব্যান্ডেল থেকে কালনা। স্টেশন থেকে অটো বা টোটোয় কিম্বা রিক্সায় ১০৮ শিব মন্দির। ১০৮ শিব মন্দিরের উল্টোদিকের চত্বরে অনেকগুলি মন্দির রয়েছে। এছাড়া আরও কিছু মন্দির রয়েছে সামান্য কিছু দূরে। কালনার মাখা সন্দেশ বিখ্যাত।
৪) আটচালা শিব মন্দির, বাগটিকরা, দাঁইহাট, বর্ধমান পূর্ব
কাটোয়া লোক্যাল ট্রেনে হাওড়া/ ব্যান্ডেল থেকে দাঁইহাট। স্টেশন থেকে অটো বা রিক্সায় বাগটিকরা।
৫) লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর, বর্ধমান পূর্ব
হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে বর্ধমান লোক্যাল ধরে দেবীপুর। স্টেশন থেকে অটো বা রিক্সায় দেবীপুর গ্রামে।
৬) বৈদ্যপুরের মন্দির রাজি, বর্ধমান পূর্ব
হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে বর্ধমান লোক্যাল ধরে বৈঁচি স্টেশন। স্টেশন থেকে কালনাগামী বাসে আধঘণ্টায় বৈদ্যপুর। বৈদ্যপুরের দেউল মন্দিরটি অতি প্রাচীন। হেঁটে মন্দির গুলি দেখতে হবে। বৈদ্যপুরের মাখা সন্দেশ বিখ্যাত।
৭) শ্রীবাটি গ্রামের মন্দিরগুলি, বর্ধমান পূর্ব
কাটোয়া লোক্যাল ট্রেনে হাওড়া/ ব্যান্ডেল থেকে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে মালডাঙ্গাগামী বাসে সিঙ্গি মোড়। সিঙ্গি মোড় থেকে অটো বা রিক্সায়। এখানে তিনটি মন্দির রয়েছে।
৮) বড় নগরের মন্দির রাজি, মুর্শিদাবাদ
নাটোরের রানী ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরগুলি দেখতে হলে ট্রেনে আজিমগঞ্জ। সেখান থেকে অটো।
৯) শ্রীধর মন্দির, সোনামুখী, বাঁকুড়া
বর্ধমান অথবা দুর্গাপুর থেকে বাসে সোনামুখী পৌঁছে। বাজার পাড়ায় শ্রীধর মন্দির দেখা।
১০) সোনাতোড় পাড়ার পরিত্যক্ত মন্দির, সিউড়ি, বীরভূম
হাওড়া বা বর্ধমান থেকে ট্রেনে সিউড়ি অথবা বোলপুর থেকে বাসে সিউড়ি। সোনাতোড় পাড়ার পরিত্যক্ত মন্দিরটি আর্কিওলজি বিভাগ কর্তৃক অধিগৃহীত।
১১) গনপুরের মন্দিরগুলি, বীরভূম
হাওড়া বা বর্ধমান থেকে রামপুরহাটগামী ট্রেনে মল্লারপুর। মল্লারপুর স্টেশন থেকে সামান্য একটু হেঁটে মল্লারপুর-সিউড়ি স্টেট হাইওয়ের মোড় থেকে বাসে গণপুর। এখানে অনেকগুলি মন্দির রয়েছে।
১২) রাউতারা গ্রামের মন্দিরগুলি, হাওড়া
কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে রাউতারার সরাসরি বাস মেলে।

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি চলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য লেখা।

সাভারের জাতীয় শহীদ-স্মৃতি সৌধ

অতীন চক্রবর্তী

"এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা
আনল যাঁরা
আমরা তোমাদের ভুলবো না"

সাভারে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা ওই চারটি পংক্তি প্রবেশদ্বার দিয়ে এগিয়ে যেতেই নজরে এল। ঢাকা থেকে ৩২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে সাভার। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে হওয়া বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তথা মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে বিশাল এই জাতীয় স্মৃতি সৌধ (National Martyrs' Memorial) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গড়ে তুলেছে এই সাভারের বুকে। মুক্তিযুদ্ধ .. হয়েছিল ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। ১৬ ডিসেম্বরে বাঙলাদেশীরা বিজয় পতাকা দেশের মাটির বুকে ওড়াতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের সরকার বা জনসাধারণ ভোলে নি সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন উৎসর্গের কথা। তাইতো স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ এই সাভারের শহীদ স্মৃতি সৌধকে গ্রহণ করেছে আধুনিক কালের একটি তীর্থভূমি রূপে।

কাদের সিদ্দিকী এবং অন্যদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা যখন এগিয়ে চলেছিলেন রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে তখন এই সাভার ছিল শেষ বাধা। তারপর সব শেষ, পরাজিত হয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষে নিহত হয় কিশোর গোলাম দস্তগীর। সাভারের সেন্ট্রাল ক্যাটল ব্রিডিং অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্ম-এর প্রধান গেটের কাছে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাঁর সম্মানে একটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করেন সেখানে।

সাভার নামটির উৎপত্তিস্থল হল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বংশাবতী(বর্তমানে বংশী নামে পরিচিত) নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত প্রাচীনতম সর্বেশ্বর (("সবকিছুর পালনকর্তা") নগরী বা সোস্তর। যা ছিল প্রাচীন সম্ভঘ রাজ্যের (Sambagh Kingdom) রাজাদের রাজধানী। পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলিও জানিয়ে দেয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাল রাজবংশের হরিশচন্দ্র নামে একজন বৈষ্ণব রাজার রাঢ় অঞ্চল থেকে এইখানে আগমনের কথা। তবে হরিশচন্দ্রের রাজত্বের পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্কের কারণ একই নামে সন্ধান পাওয়া যায় - সেইসময়কার পৌরাণিক সূর্যবংশের রাজা হরিশচন্দ্র আবার বিক্রমপুরের রাজা হরিশচন্দ্রের। তবে যে কোন ক্ষেত্রেরই হোন না কেন সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র, স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে বোন রাজেশ্বরীর পুত্র দামোদর দ্বারা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তিনি। তবে এ ব্যাপারে সবাই এক মত যে এই সাভারে কোন এক সময় জনৈক হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন, আর নগরীর নাম তখন ছিল সর্বেশ্বর বা সোস্তর।

ঢাকা শহরের দৈনিক ডেস্টিনি অফিসের কাছ থেকে আমাদের সাভারের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই অফিসের কাছেই আমাদের হোটেল। এই যাত্রার আগের দিন ওই অফিসে যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তা আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আজও রয়েছে। সাভারের সুন্দর এই স্মৃতি স্তম্ভটির কথা ওঁদের কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারি। এটি সৈয়দ মইনুল হোসেনের ডিজাইন এবং কনসার্ড গ্রুপ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। স্মৃতিসৌধের পরিকল্পনা ১৯৭৬ সালে শুরু হয়। প্রথমে উপযুক্ত একটি জায়গা নির্বাচন, তারপরে রাস্তা ও ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। এত বড় প্রোজেক্টের ভার যাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে তাঁকে খুঁজে পাওয়া বেশ এক কঠিন কাজ। চাই সুন্দর এক আকর্ষণীয় নকশা। অবশেষে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এক নকশা প্রতিযোগিতা। মোট সাতান্নটি জমা দেওয়া নকশা থেকে মূল্যায়ন হিসাবে শেষে সৈয়দ মইনুল হোসেনের নকশা নির্বাচন করা হয়। সাতটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আকৃতির দেওয়াল বা প্রিজমগুলির আকারে গঠিত এক আকর্ষণীয় স্মৃতি সৌধ সেই নকশায় তুলে ধরা হয়েছিল। গঠনের সর্বোচ্চ শিখর একশ পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় পৌঁছায়। এই পিরামিড আইকনটি (pyramidal icon) শুধুমাত্র ভাস্কর্যের কাঠামোর রূপই ধারণ করে নি, বরং, পুরো কমপ্লেক্সটা ডিজাইন করা হয়েছিল সামগ্রিক দৃশ্যাবলীর এক জ্যামিতিক বিন্যাসকে লক্ষ্যে রেখে। এরই সঙ্গে সংলগ্ন, সবুজ এলাকা, কৃত্রিম হ্রদ, সুপরিকল্পিত কংক্রিট গঠিত সুসজ্জিত পথ ইত্যাদি মিলে পরিপূর্ণ হয়েছে একটি উজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ। দেওয়ালের এই সাতটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতি প্লেনগুলোর (isosceles triangular planes) প্রতিটি হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সাতটি অধ্যায়ের রূপক, যেমন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের ইউনাইটেড ফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-বিষয়ের আন্দোলন (6-point Movement), ১৯৬৯ সালের গণ বিদ্রোহ, এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের বর্বরোচিত অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পায়।

১৯৭৪ থেকে ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয় ধাপে গণকবর, হেলিপ্যাড, পার্কিং স্পেস এবং পায়ে চলার পথ নির্মাণ করা হয়। ১৯৮২ সালে তৃতীয় পর্যায়টিতে প্রধান স্মৃতিস্তম্ভ, সবুজক্ষেত্র, কৃত্রিম হ্রদ এবং অন্যান্য সুবিধাগুলো সম্পন্ন করা হয়। কমপ্লেক্সের এই সব নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হবার পর ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই স্মৃতি সৌধটির পরিপূর্ণরূপে উদ্বোধন করা হয়।

দৈনিক ডেস্টিনি অফিসের কয়েকজন গণ্যমান্য সুজনদের কাছ থেকে সাভার সম্পর্কে কিছু জানার পর আর দেরি না করে পরের দিন খুব সকালেই আমরা বেরিয়ে পরেছিলাম সাভারের উদ্দেশ্যে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানে আসার অনেক সুব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রাইভেট গাড়ি ছাড়াও ভালো বাসগুলোর চলাফেরা রয়েছে এই রুটে। রাস্তাও মোটামুটি। এক কথায় সব মিলিয়ে এই পথ চলায় শ্রান্তি থাকলেও শান্তি আছে। অল্প পথ। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। সকাল সকাল আসার সুবিধা হল ভিড়টা তখনও অতোটা হয়ে উঠতে পারে নি। তবে শুনেছি বিকেল-সন্ধ্যায় দর্শকদের আগমন অনেক বেশি। উত্তরের প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেই মনটা নিজের থেকেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বাঙালিদের আত্মশাসনের অধিকারের জন্য জীবন উৎসর্গ, দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের যোদ্ধাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্মৃতিবহনকারী এই সৌধ। সৈয়দ মইনুল হোসেনের এই সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপত্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে শত শত বাঙালি শহীদদের রক্তঝরার ইতিহাস। এখানে এসে পরবর্তীযুগের বাংলার মানুষ এঁদের আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করবে, জানাবে তাদের প্রাণের শ্রদ্ধা।

স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পার্কটি বড় এবং সুসংগঠিত। রয়েছে লিলিফুলে ভরা জলাশয়। কতো জানা-অজানা শহীদদের আত্মত্যাগের কথা জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে। তাঁদের আত্মবলিদানের রক্তে রাঙানো পথ ধরেই এসেছে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। তাঁদের স্মৃতি স্মরণ করেই তৈরি হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ । নাম জানা-অজানা সব শহীদদের আত্মত্যাগের সম্মান এখানে দেওয়া হয়েছে। দশটি সুন্দর গণকবর নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে "অজ্ঞাতনামা শহীদদের কবর"।

ভাস্কর্য স্থাপনের ভিত্তিফলকের প্ল্যাটফর্মটি স্মৃতিস্তম্ভের সামনেই স্থাপন করা হয়েছে। রয়েছে জলাধারের একটি পুল। প্রধান কমপ্লেক্সের জন্য মোটামুটি চুরাশি একর জমির প্রয়োজন ছিল কিন্তু সরকার প্রায় একশ দশ একর জমি অধিগ্রহণ করে ভাস্কর্য শিল্পের পাশাপাশি প্রাকৃতিক শোভাতে পুরো কমপ্লেক্সটিকে সুন্দর একটি রূপ দিয়ে সাজাতে সহযোগিতা করেছিলেন।

প্রধান কমপ্লেক্সের দিকে এগিয়ে যাবার পথেই আলাপ হয়েছিল এক শিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে। চট্টগ্রামের বাংলা উচ্চারণে ওঁরা কথা বলছিলেন, আমাদের পক্ষে বুঝতে পারা মুস্কিল। ভদ্রমহিলা প্রফেসর আর স্বামী একজন আর্কিটেকচার ইঞ্জিনীয়র। এর আগে কয়েকবার এখানে এসেছেন। ওঁদের সঙ্গেই এখানকার আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। চলার পথেই উনি আমাদের জানিয়েছিলেন- "This winding passage also allows the visitor to see the monument from multiple perspectives, experiencing its dramatically differing configurations depending on the viewing location. To many, the visual magic of the National Martyrs' Monument lies in its optical illusion, perhaps a picaresque cubist twist to what "nation" means.."। জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভের চরমপন্থী পথটি (tortuous path) স্ব-শাসনের জাতিগত কঠিন পথ, পাশাপাশি এগিয়ে থাকা চ্যালেঞ্জিং যাত্রার প্রতীক হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

এই অপটিক্যাল বিভ্রমের অংশটি স্মৃতিস্তম্ভের পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত। সামনের দিক থেকে দেখে এটি একটি কাঠামো বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়। স্মৃতিস্তম্ভ পরিকল্পনা সাতটি স্বাধীন স্থায়ী কংক্রিট প্লেটের ব্যবস্থার উপর। প্রতিটি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, কিন্তু উচ্চতা এবং বেস বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে। প্লেট নব্বই ডিগ্রী কোণে রেখে মাঝখানে ভাঁজ করা হয়। সর্বাধিক প্লেট একশ পঞ্চাশ ফুট সর্বনিম্ন বেস কুড়ি ফুট, এবং সর্বনিম্ন প্লেট হচ্ছে দীর্ঘতম একশ তিরিশ ফুট। আবার জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ গঠনে সংখ্যাসূচক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এক অর্থ পালন করে। Athenian Parthenon এর হিসাবে এই ধরনের আধিপত্য কাঠামোগুলির সংগঠন নীতিগুলি স্মরণ করে, যা সংখ্যায় আদর্শ স্থাপত্য সৌন্দর্য এবং অনুপাতের দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে দেখা যায়। জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভের ম্যাজিক ফিগার সাত, যা ১৯৫২ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ আন্দোলনের সংখ্যা। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫২ সালে ভাষা

আন্দোলন ৫+২=৭ ছিল;, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার দিনে ১+৬=৭ ছিল; এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য ৭ জনকে বীরশ্রেষ্ঠ যুদ্ধের নায়ক হিসাবে বাংলাদেশ সরকার সম্মানিত করেছিলেন। এই সব স্মরণ রেখেই সাতটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতি প্লেন দিয়েই গঠিত হয়েছে এই স্মৃতি সৌধ। স্মৃতিস্তম্ভের অভ্যন্তরে পার্কটি বড় এবং সুসংগঠিত। এই রকম এক অতুলনীয় উন্নতমানের স্থাপত্যশিল্পের স্রষ্টা সৈয়দ মইনুল হোসেনকে এইজন্য ১৯৮৮ সালে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

বাঙালিদের আত্মশাসনের অধিকার ফিরিয়ে আনতে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে সেইসব জাতীয় শহীদদের স্মৃতির জাতীয়তা উদযাপন উপলক্ষে জাতির যৌথ অনুষ্ঠানগুলির কেন্দ্রস্থল হল এই স্মৃতি সৌধ।

"মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা,
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ প্রথম অধ্যায়..."

"ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে- নগরে-বন্দরে,
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেরে স্বপ্নময় ঘরে।।"

শান্ত পরিবেশে সংলগ্ন পার্কের লালরাস্তার ওপর দিয়ে বেশ কিছুটা সময় এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। রোদের তীব্রতা থাকলেও গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে হাঁটতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। ডানপাশ দিয়ে একটা হাল্কা জলস্রোত বয়ে চলেছে। সময় কাটাবার সুন্দর পরিবেশ।

এটি তৈরি করতে প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমাণ অর্থের। অন্যদের সঙ্গে তখন এগিয়ে এসেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার দিনের ভাইস চ্যান্সেলর দেখতে এসে জানতে পারেন যে এটি নির্মাণের জন্য অজস্র টাকা খরচ হবে, তখন তিনি কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন। অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে সেইসময় দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (DUCSU)এর প্রচেষ্টা একটা বড় ভূমিকা ছিল। তিনটি ফেজের এই কাজ, তার ওপর গণকবর, হেলিপ্যাড, পার্কিং স্পেস এবং পায়ে চলার পথ, ইত্যাদি নির্মাণের জন্য সব মিলিয়ে শেষে আরো অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। একে একে সব কাজই ভালোভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এরপর ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর DUCSU-এর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এটির প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বারো জন মুক্তিযোদ্ধা বীরকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে উদ্বোধন করাবার জন্য আনা হয়েছিল। এই ভাবেই বাংলাদেশের জনগণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিরকাল সম্মান দিয়ে এসেছে।

ফিরে আসার আগে শেষবারের মতো শহীদ-স্মৃতি সৌধের দিকে তাকিয়ে সেইসব মুক্তিবীরের প্রতি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় জানালাম -

"হাজার সেলাম তাই নাও আজ, শেষযুদ্ধের সাথী..."

অবিভক্ত ভারতের রাজশাহী জেলার নওগাঁতে জন্ম অতীন চক্রবর্তীর। সরকারি পেশা এবং ভ্রমণের নেশার টানে ঘুরেছেন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে। দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লিখছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কারও।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 4
গড় : 4.50
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

একটি চাদরাবৃত অভিজ্ঞতা

অভিষেক মারিক

~ *চাদর ট্রেকের আরও ছবি* ~

সবে রাত আটটা বাজে। অফিসবাস তখন নিউটাউন এলাকার ঝকঝকে পিচের রাস্তা দিয়ে রীতিমতো উড়ে চলেছে। বাহারি রঙিন আলোয় চোখ ঝলসে যায়। উড়ন্ত বাস সিটি সেন্টার টু-এর সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল। মেট্রো রেলের কাজ চলছে। সারা রাস্তা জুড়ে পিলপিল করছে গাড়ি। শম্বূকগতিতে চলা ছাড়া গতি নেই। ঝাঁ চকচকে সিটি সেন্টার আসন্ন প্রজাতন্ত্রদিবসের আলোকে সেজে উঠেছে। প্রচুর লোকের সমাগম। লোভনীয় খাবারের সম্ভার, জামাকাপড়ের আকর্ষণীয় বিপণি। তথাকথিত উচ্চমানের জীবনযাত্রার নিদর্শন।

পিছনের সিট থেকে জনৈক সহযাত্রী (সহকর্মীও বটে) সারারাজ্যের বিরক্তি উজাড় করে বললেন, "আর পারা যায়না! প্রতিদিন সেই একই গল্প! অফিস থেকে বাড়ি যেতে যেতেই দুঘণ্টা কাবার। কোথাও রাস্তা খুঁড়ে রাখছে, কোথাও মিনিটে মিনিটে আটকে দিচ্ছে! ট্র্যাফিক সিস্টেম পুরো ওয়ার্থলেস! দিনে দিনে শহরটা যেন নরক হয়ে যাচ্ছে!"

একমাস আগে হলেও হয়ত যোগাযোগব্যবস্থার প্রতি ক্রুদ্ধ সহযাত্রীর এই বিষোদ্গারে আমিও সামিল হতাম। কিন্তু এবার তা পারলাম না। গত সপ্তাহের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টে দিয়েছে। সত্যি স্থানবিশেষে মানুষের চিন্তাভাবনায় কতই না পরিবর্তন আসে! কোথাও হাজার সুবিধা পেয়েও মানুষের ক্ষোভের কোনো অন্ত নেই, কোথাও আবার কিছুই না পেয়ে মানুষের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ইটপাথরের হাইটেক জঙ্গল ছেড়ে চিন্তাভাবনারা ডানা মেলে উড়ে গেল প্যাস্টেলরঙিন পর্বতসমূহের মাঝে ছড়ানো শুভ্রশীতল চাদরের ওপরে দিয়ে কাঠের স্লেজগাড়ি বয়ে নিয়ে চলা জাঁসকারী মানুষগুলোর কাছে।

তিনদিন হয়ে গেছে লেহ এসেছি। মধ্য জানুয়ারির হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডাটায় এখনও পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারিনি। দিনের বেলা মাইনাস দশ ডিগ্রি আর রাতের দিকে তাপমাত্রার পারদ গড়ে মাইনাস চব্বিশে নেমে যাচ্ছে। আগেরদিন ভোররাতে তো মাইনাস আটাশে নেমেছিল। হোটেলের রুমহিটার ছিল তাই রক্ষে। কিন্তু এরপর কী যে হবে কে জানে! আমাদের ট্রেক শুরু হবে কাল থেকে। এই ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নিচে তাঁবুর ভিতরে বেঁচে থাকব তো! ট্রেকলিডার রজত বলেছেন কম করে চারটে আপার লেয়ার, দু-তিনটে লোয়ার লেয়ার ও দুটো মোজা অবশ্যই পরতে। মাথা, হাত, কান, মুখ, নাকও যতটা সম্ভব যেন ঢাকা থাকে। রজতের কথা মত আমরা দুদিন আগে লেহ থেকেই ড্রেস রিহার্সাল শুরু করে দিয়েছিলাম। আজকের পরে পাঁচদিন থাকবে না .কানো রুমহিটার, রাতে শোয়ার নরম গদি, ননভেজ খাবার, ইন্টারনেট বা মোবাইল পরিষেবা। তাই হোটেলের ওয়াই-ফাইয়ের সদ্ব্যবহার করে পেটপুরে মুরগির ঝোল সাঁটিয়ে হিটারের উষ্ণতা মেখে বিছানায় প্রায় মিশে গেলাম। গত পাঁচবছর ধরে দেখে চলা স্বপ্নকে অবশেষে বাস্তবায়িত করার পালা। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া চাদরসদৃশ জাঁসকার নদীর বুকে পা রাখার স্বপ্নকে পূরণ করার পালা।

সিন্ধুনদের এক অন্যতম উপনদী জাঁসকার। লেহ শহর থেকে কিছু কিলোমিটার দূরে নিম্মো বলে এক গ্রামের কাছে সিন্ধুর জলে মিশে যায় জাঁসকার। এই নদীর অববাহিকাই জাঁসকার উপত্যকা নামে পরিচিত। দুর্গম পর্বতের অন্তরালে স্থিত এই উপত্যকার পাদাম, লিংশেড, নেরাক গ্রামগুলো প্রায় সারা বছরই লাদাখের অন্যান্য এলাকার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কার্গিলের দিক থেকে পাদাম যাওয়ার একটা রাস্তা থাকলেও অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে অনেক সময়ই সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শীতকালে জাঁসকারের জল জমে গেলে সেই জমাট নদীখাতই হয়ে ওঠে

বহির্বিশ্বের সাথে জাঁসকারী জনজাতির একমাত্র যোগাযোগের পথ। তাই জাঁসকার নদীর বরফের সাদা 'চাদর'ই স্থানীয়লোকদের কাছে জীবনধারণের পথ - রুজিরুটি, ভগবান, মা। প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে জীবনের অনুকূলে নিয়ে আসার এক অনন্য উদাহরণ এই 'চাদর'। ঠিক কবে থেকে এই প্রথা চলে আসছে তা কেউ ঠিক মত বলতে না পারলেও স্থানীয় লোকেদের মতে এই রীতি প্রায় হাজার বছরের পুরনো। বহিরাগতরা 'চাদর' বলতে জমেযাওয়া শ্বেতশুভ্র নদীর বিস্তৃত পথ বুঝলেও লাদাখি ভাষায় এর মর্মার্থ কিছুটা আলাদা। 'চা' শব্দের অর্থ পাখি ও 'দর' শব্দের মানে বরফ। কথিত আছে হাজার হাজার বছর আগে রূপকথার এক পাখির (হিরামন পাখি নাকি!) মুখে স্থানীয়রা প্রকৃতির বানানো এই তুষারপথের কথা জানতে পারেন। সেই থেকে 'চাদর' নামে পরিচিত এই বরফের নদীপথ। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাঁসকারী মানুষদের জীবন সংগ্রামের এই পথ পরিবর্তিত হয়েছে শহুরে লোকেদের ক্ষণিকের অ্যাডভেঞ্চার ট্রেকিংয়ে। সেই গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে আমিও চলে এলাম রোমাঞ্চের টানে চাদরের বুকে।

আমাদের ট্রেকের যেখানে শুরু, লেহ থেকে সেখানে আসতে প্রায় দুঘণ্টা মত লাগল। পুরো রাস্তা মোটামুটি ভালো হলেও শেষের কিছু কিলোমিটার এবড়োখেবড়ো। জাঁসকার নদীর গা বেয়ে চলে যাওয়া এই রাস্তা তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। রাস্তা যেখানে গিয়ে আপাতত শেষ হয়েছে সেখানেই ট্রেকের শুরু। প্রতিবছর রাস্তা যত সামনে এগিয়ে চলবে ট্রেকের মেয়াদও তত কমতে থাকবে। এক সহযাত্রী চাদর ট্রেকের ভবিষ্যৎ নিয়ে আফসোস করলে রজত তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর মতে এখানকার সাধারণ মানুষের কাছে সবরকম সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই রাস্তা খুবই জরুরি। জাঁসকারী লোকেদের কাছে দুমাসের ট্রেকিং-এর সুবাদে আয়ের তুলনায় সারা বছরের সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশি কাম্য।
ট্রেকিং শুরুর আগে রজত সবাইকে ডেমো দিলেন চাদরের ওপরে কোথায় কীভাবে চলতে হবে। যেখানে বরফের চাদর গুঁড়ো গুঁড়ো, ওপরের আস্তরণ এবড়োখেবড়ো, সেখানে স্বাভাবিকভাবে চললেই হবে। কিন্তু চাদর বেশিরভাগ স্থানেই সম্পূর্ণ মসৃণ, একটা আইসকিউবের ওপরের তলের মত পিচ্ছিল। চলতে গেলেই চিৎপটাং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সামনের দিকে হাল্কা ঝুঁকে পা ঘষে ঘষে নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অনেকটা আইস স্কেটিং করার মত আর কী!
ডেমোর পরে খেয়েদেয়ে শুরু হল চাদরে গা ভাসানোর (পড়ুন 'পা ভাসানো') পালা। আমাদের সকলের সামনে আছে বছর তিরিশের লাদাখি যুবক জাম্পেল। সে-ই আমাদের পথপ্রদর্শক, গাইড। সবার পিছনে রজত। মাঝখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কিছু অ্যাডভেঞ্চারলোভী মানুষ। আমাদের বাবুর্চি, পোর্টার, হেল্পাররা খাওয়াদাওয়ার পরে সবকিছু গুছিয়ে আসবেন। গুটিগুটি পায়ে পেঙ্গুইনের মত চলেছি আমরা। সবাই একটু বেশিই সতর্ক হয়ে চলেছি। এই বুঝি পড়ে গেলাম। সামনে এঁকেবেঁকে চলে গেছে বরফের নদী। লাল, খয়েরি, হলুদ, কমলা, কালো, আরও কত কী রঙে সাজানো ন্যাড়া পাহাড় আকাশছোঁয়া দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই বুক কেটে বরফের ছুরির মত বয়ে গেছে জাঁসকার। মাঝে মাঝে এখানেসেখানে ফাটল বা গর্তের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফেনিল নীল খরস্রোত। পায়ের নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে এক খরস্রোতা নদী – ভেবেই গায়ে কাঁটা দেয়।

প্রথমদর্শনের মুগ্ধতার পালা শেষ হতেই চাদর তার আসল রূপ দেখাতে শুরু করল। আরম্ভ হল পতনের অর্কেস্ট্রা। এক সহযাত্রী, তড়িৎ, গাইড জাম্পেলের কথা ঠিকমত না শুনে অন্যপথে যেতে গিয়ে চাদরের পাতলা আস্তরণে পা দিলেন। ব্যাস আর যান কোথায়! তড়িৎবাবু তড়িৎবেগে ঢুকে গেলেন জাঁসকারের বুকে! সেখানে জল ছিল কোমর অবধি, স্রোতও সেরকম নেই। ভেসে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই সেখানে নেই। তাও তড়িৎবাবু নিজেকে বাঁচানোর স্বাভাবিক তাগিদে হাতপা ছুঁড়ে উঠতে চাইলেন ও আশেপাশের কিছুটা চাদর ভেঙে ফেললেন। অবশেষে জাম্পেল ও অন্য একদলের গাইডের মাধ্যমে ওনাকে ওপরে তোলা হল। রজতের কথামত সবাই পিঠের ব্যাগেই অতিরিক্ত দুজোড়া মোজা ও প্যান্ট ছিল। তড়িৎবাবুকে তাড়াতাড়ি মুছিয়ে শুকিয়ে জামাকাপড় পাল্টে ওয়ার্মি ব্যবহার করে গরম করা হল। আধঘণ্টা বাদে যাত্রা পুনরারম্ভ হল। বাকি সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম – এবার কার পালা?
সৌভাগ্যবশত তড়িৎবাবুর মত সঙ্গিন অবস্থা বাকিদের হয়নি। তবে কম করে একবার সবারই ছন্দপতন প্রায় হয়েছে। মানুষ যে কত বিভিন্ন ভাবে বিচিত্র ভাবে পড়ে যেতে পারে তা হয়ত এই ট্রেকে না এলে জানতে পারতাম না। কেউ পিছনে উল্টে, কেউ সামনে মুখ থুবড়ে, কেউ থেবড়ে বসে, কেউ পাশে টাল খেয়ে, কেউ দু'পা ছড়িয়ে, কেউবা প্রায় ডিগবাজি খেয়ে কুপোকাত হলেন। আমিও বাকি থাকি কেন? পিছনে আসা সহযাত্রীকে অতিরিক্ত পিচ্ছিল বরফসম্পর্কে সতর্কে করতে গিয়ে নিয়েই পা হড়কে থেবড়ে বসে পড়লাম পাথরের মত বরফে। পশ্চাৎদেশ আর কোমরে এতটাই লাগল যে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। পিছনে আসা সহযাত্রী চিন্তিত হয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঠিক আছি কিনা। ব্যথায় টনটন করলেও নিজেকে ছোট দেখাতে নারাজ আমি 'একদম ঠিক আছি' বলে লাঠি ধরে আস্তে আস্তে উঠে বসে ধীরগতিতে চলতে থাকলাম। সেই ব্যথার রেশ দুসপ্তাহ পর্যন্ত রয়েছিল!
তবে ঘনঘন পতনও আমাদের আটকাতে পারেনি। মন্থরগতিতে হলেও এগিয়ে চললাম। উঁচু পাহাড়েরা বেশিরভাগ স্থানেই সূর্যালোক আটকে রেখেছে। তার সঙ্গে পাহাড়ের মাঝখান থেকে বয়ে আসছে হাড়জমানো ঠাণ্ডা হাওয়া। দিনের বেলা তাপমাত্রা মাইনাস পনেরোর কাছাকাছি। যতক্ষণ চলতে থাকছি সেরকম ঠাণ্ডা লাগছে না। কিন্তু দুমিনিট দাঁড়িয়ে গেলে পায়ের হাল্কা ঘাম জমে বরফ হয়ে গিয়ে পায়ের আঙুল অবশ করে দিচ্ছে। কোথাও বিশ্রাম করতে হলেও এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই তাই ক্রমাগত 'লেফটরাইট' করে যেতে হচ্ছে। অল্প হলেও কিছু জায়গাতে সূর্যের আলো পাওয়া গেল। সাদা বরফ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে চোখ ঝলসে দেয়। সানগ্লাস ছাড়া গতি নেই সেখানে।

চাদর আমাদের প্রতি মুহূর্তে অবাক করে চলেছে। কোথাও কংক্রিটের মত বরফের চাঁই, কোথাও নীলাভ পাতলা স্তর, কোথাও স্বচ্ছ কাঁচের মত বরফের নিচে দৃশ্যমান নদীর বুকের নুড়িপাথর, তো কোথাও নদীর জমে যাওয়া ঢেউ। কোথাও চাদর এতটাই জমাট বাঁধা যে নদী বলে মনেই হয়না। দুই পাহাড়ের মাঝে বরফঢাকা জমি যেন। কোথাও নদীর দুপারের কেলাসিত বরফের পুরু আস্তরণের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে চঞ্চলা ভয়ংকর জলের ধারা। কোথাও আবার চাদরের চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। নুড়িপাথরময় পাহাড়ের বুকে সবুজের দেখা পাওয়া যায়না। একদম শিখরের দিকে পবিত্র জুনিপার গাছের বিচ্ছিন্নভাবে দেখা মিললেও পাহাড়ের দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন। তাই গাছের শেকড়বিহীন আলগা মাটিতে সাবধানে চলতে হয়। পা হড়কে যাওয়ার ভয় থাকে। আর এখানে পড়ে যাওয়া মানে বরফগলা নদীর বুকে সমাধি। জলের টানে বরফের মোটা চাতালের নীচে একবার চলে গেলে জীবনদীপ ওখানেই নির্বাপিত হবে।

প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা চলার পরে প্রথম রাতের ক্যাম্প সোমোতে এসে পৌঁছলাম। নদীর বাঁপাশে পাহাড়ের ঢালে আমাদের ক্যাম্পসাইট। পৌঁছে দেখি অবাক কাণ্ড। আমাদের ক্যাম্পগুলো ইতিমধ্যে টাঙানো রয়েছে। আমাদের সাহায্যকারী দল আমাদের জন্যে গরম চা-স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পান করার গরম জলও রেডি। এঁরা সবাই আমাদের পিছনে ছিলেন। কখন কী করে অতিক্রম করে চলে এলেন বুঝতেই পারিনি। সাহায্যকারী দলের সবাই স্থানীয় জাঁসকারী বা লাদাখি। পথে অনেক স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে দেখা হল - কাঠের ছোট্ট স্লেজগাড়ি করে মাল বয়ে নিয়ে আসছিলেন তাঁরা। অসহ্য ঠাণ্ডা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও অপরিচিত বহিরাগতদের দেখে 'জুল্লে' বলে সৌজন্য দেখাতে ভোলেননি। লাদাখি ভাষায় 'জুল্লে' শব্দের অর্থ 'নমস্কার'। উত্তেজনার বসে আমরা এটাই ভুলে গেছিলাম কে আমাদের রাতে খাবার বানিয়ে দেবে, বাসন মাজবে, জল গরম করবে, ক্যাম্প টাঙাবে। এঁরা কিন্তু নিজেদের দায়িত্বে অবহেলা করেননি। প্রতিকূল পরিবেশেও আমাদের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য আপ্রাণ খেটে চলেছেন।

রজতের আদেশানুসারে ক্যাম্পে এসেই আগে মোজা পালটে নিলাম। স্যুপ, রুটি তরকারি উদরস্থ করে তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণতায় আশ্রয় নিলাম। জাম্পেলের কথামত গামবুটজোড়াকে মাথার বালিশ বানিয়ে দেখলাম বেশ আরামের। বাইরের তাপমাত্রা তখন প্রায় মাইনাস একুশ। তবে এক ক্যাম্পে তিনজন একসঙ্গে শোয়াতে রাতে সেরকম ঠাণ্ডা লাগল না।

দ্বিতীয় দিন প্রাতরাশ সেরে সকাল নটার মধ্যে সবাই বেড়িয়ে পড়লাম পরবর্তী ক্যাম্প টিব গুহার উদ্দেশ্যে। সকালবেলা স্লিপিং ব্যাগের ওম ছেড়ে বাইরের ফ্রিজারে পা রাখা অত্যন্ত দুষ্কর হচ্ছিল। তবে এই ঠাণ্ডায় কাঁপুনির চেয়েও ভয়ংকর প্রাতঃকৃত্যের ভাবনা। শহুরে শৌখিন মানুষদের রাজ্যের জামাকাপড় চাপিয়ে গর্তোখোঁড়া পিট টয়লেটে গিয়ে বসতে গেলে যে কি সাংঘাতিক মানসিক ও শারীরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। জল ব্যবহারের তো প্রশ্নই নেই, কাগজই একমাত্র ভরসা। কিছুটা পরিষ্কারপরিছন্নতার জন্য যে সিক্ত টিস্যু (Wet Tissue) ব্যবহার করব তারও উপায় নেই। সে বান্দা তো জমে পাথর! আমাদের সাথে থাকা স্থানীয় মানুষগুলোর এইসব নিয়ে কোনো ভাবনাই নেই। এইসব তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে - প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ।

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখভার। কালকের ঝকঝকে আকাশ আজ মেঘাছন্ন। রজত ও জাম্পেলের মাথায় ভাঁজ। চাদর চলাচলের যোগ্যভাবে জমে থাকার জন্য পরিষ্কার আকাশ খুবই দরকার। তাই বুকে আশঙ্কা নিয়েই এগিয়ে চললাম। আজকের প্রেক্ষাপট যেন আরও বেশি নাটকীয়। অর্ধেক ও পূর্ণ জমে যাওয়া কিছু জলপ্রপাত, বিস্তৃত এলাকা ছেড়ে হঠাৎ করে খুব সরু নদীখাতে ঢুকে পরা, দুরন্তবেগে ঢালের দিকে বয়ে চলা নদীর পাশের পাহাড়ে দড়ি বেয়ে সন্তর্পণে এগোনো, গ্লাস সারফেসের মত চাদরের পাশে শান্ত নীল ধীরগতিতে বহমান ধারায় বরফের চাঁইদের ভেসে চলা - প্রকৃতির ভয়ংকর সুন্দর রূপ কি একেই বলে?!

পথ চলতে চলতে শুরু হল তুষারপাত। প্রথম প্রথম খুব হাল্কা ভাবে হলেও একসময় খুব বেশিই পড়তে থাকল। খয়েরি পাহাড়ে যেন কেউ ধীরে ধীরে চকের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে। হোটং বলে একটা জায়গায় এসে আমরা সবাই দাঁড়ালাম। সামনে চাদরের স্তর একটু গলে গেছে। গোড়ালির একটু ওপর পর্যন্ত জল উঠছে। যদিও গামবুট পরে থাকায় পা ভিজে যাবেনা এই জলে। কিন্তু রজত স্থানীয় লোকেদের সাথে পরামর্শ করে আগে না যাওয়ার ফয়সালা করলেন। কারণ আজকের খারাপ আবহাওয়ায় চাদর আরও গলে যাবে তাতে ফেরত আসা মুশকিল হবে। এই ঠাণ্ডায় কোথাও আটকে গেলে আর বাঁচায় কে! তাই হোটংয়েই ক্যাম্প করা হবে স্থির হল। আমাদের সঙ্গে একটি দল ছাড়া বাকিরা সামনে এগিয়ে গেল ওই জলের মধ্যে দিয়েই। তাতে আমাদের দলের কেউ কেউ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁদের ধারণা আমরাও পারলে এগিয়ে যেতে পারতাম। রজত তাঁদের আশ্বস্ত করলেন কালকে আবহাওয়া ঠিক হলে চাদর আবার জমে গেলে আমরা সামনে অবশ্যই যাব।

যাইহোক যতক্ষণে ক্যাম্প লাগানো হচ্ছে আমরা পাহাড়ের গায়ে এক গুহাতে আশ্রয় নিলাম। যখন চাদরে চলা শহুরে মানুষদের রোমান্টিসিজমে পরিণত হয়নি, যখন চাদর মানেই ছিল শুধুমাত্র জীবন সংগ্রাম, জাঁসকারী মানুষেরা তখন এইসব গুহা রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহার করতেন। ক্যাম্পের চেয়ে বেশি আরামদায়ক এই গুহাগুলো। এখনো ট্রেকিংয়ের সময় বাবুর্চি, পোর্টার, হেল্পাররা এইসব গুহাতেই রাত কাটান। আমাদের পোর্টাররা যে গুহা দখল করেছিলেন সেখানেই আমরা সবাইও সেঁধিয়ে গেলাম। কাঠের আগুনে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে তাঁদের সঙ্গে গল্প জুড়লাম। আমাদের সামনেই কথা বলতে বলতে তাঁরা চা বানালেন, রান্না করলেন, জল গরম করলেন। আমরা বসে থাকাতে তাঁদের কাজে অনেকটাই ব্যাঘাত ঘটছিল। কিন্তু কোনো বিরক্তির প্রকাশ নেই। বরং হাসিমুখে, মজা করে, গান গেয়ে সময় কাটিয়ে দিলেন। জ্বালানি শেষ হলে শুকনো কাঠের যোগান দিলেন যাতে আমরা দেহ উষ্ণ রাখতে পারি। এই অঞ্চলে গাছপালা সেরকম নেই। আর লেহ থেকে বয়ে বয়ে প্রচুর কাঠ ট্রেকে আনাও সম্ভব নয়। এই কাঠ পেতে পাহাড়ের ওপরে উঠতে হয়। কখনো কখনো একবস্তা কাঠ যোগাড় করে আনতেই তিন চার ঘণ্টা লেগে যায় তাও সব কাঠ শুকনো পাওয়া যায় না। কথাটা হাসিমুখে জানালেন আমাদের এক পোর্টার। সামনে জ্বলতে থাকা কাঠগুলোর দিকে চেয়ে নিজেদেরকেই অপরাধী মনে হল। হয়ত এই কষ্টার্জিত কাঠ ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা রাতের বেলা গুহার মুখে জ্বালাতেন। কিন্তু আমরা একটু আগুন চাইতে হাসিমুখে আমাদেরকেই দিয়ে দিয়েছেন জ্বালানিগুলো। সত্যি মানুষগুলো কতই না সরল! প্রকৃতির প্রতিকূলতার সাথে কি মানবমনের সারল্য বৃদ্ধি পায়? নাহলে জীবনযাত্রার হাজার সুযোগসুবিধা উপভোগ করেও আমরা শহরবাসীরা এত জটিল কেন?

আগুনের স্পর্শ থেকে বাইরে আসতেই কেঁপে গেলাম। দেহ গরম করতে সবাই মিলে এক অভিনব পথ বের করলাম – চাদরের ওপরে নৃত্য। গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার চাদরের ওপরে পরে থাকাতে বরফের পিচ্ছিলতা অনেকটা কমে গেছে। নাচতে গিয়ে কেউ আর ডিগবাজি খেল না। নৃত্যচর্চা শেষ হতেই রাতের খাবারের ডাক পরে গেল। খেয়েদেয়ে এবার রাতকাটানোর পালা। তুষারপাতে ক্যাম্পের অনেকটা বরফে ঢেকে গেছে। ভিতরে ক্যাম্পের গায়েও ফ্রস্ট জমে গেছে। প্লাস্টিকের বোতলের জলও অর্ধেক জমে গেছে। তবে মেঘলা আবহাওয়ার জন্য ঠাণ্ডা অনেক কম লাগছে। পরেরদিন সামনে এগিয়ে যেতে পারব কিনা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল একদম সকাল ছটা নাগাদ। দিনের আবছা আলোয় দেখলাম আগের দিনে টানা তুষারপাতে পাহাড়ও চাদর প্রায় একাকার হয়ে গেছে সাদা রঙে। সামনে এগিয়ে চলার পথের দিকে তাকিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! সামনে চাদর বলে আর কিছু নেই। বরফের স্তর গলে জল বইছে। পা

ডোবালেই জল হাঁটুর ওপরে চলে যাবে। গামবুটের ভেতরে ঢুকে যাবে। জাম্পেল একটু এগিয়ে দেখে এলেন আগেও একই রকম অবস্থা। আশপাশের পাহাড় এতটাই খাড়া যে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া শহুরে মানুষের কাজ নয়। আমরা অপেক্ষা করলাম উল্টোদিকে দিয়ে কেউ আসে কিনা দেখার জন্য। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাহলে ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে এক যাত্রীদলের দেখা পাওয়া গেল। পোর্টার-গাইড ছাড়া দলে ছ-সাতজন লোক। প্রত্যেকের ট্রাউজার হাঁটুর অনেকটা ওপরে তোলা, প্রায় কাছা পরার মত অবস্থায় রয়েছে। পায়ে গামবুট, কিন্তু জেনেছিলাম কেউই মোজা পরে ছিলেন না। গাইড নানান উত্তেজক কথা বলে সমানে উৎসাহিত করছেন। কিন্তু দলের কাউকে দেখেই মনে হচ্ছে না তারা খুব একটা উৎসাহিত বোধ করছেন। সবার মুখ বিবর্ণ, বিভীষিকাময়। জল ঠেলে আমাদের ক্যাম্পের কাছে পাথুরে জমিতে আসতেই শুরু হল দহরম মহরম। দলটির এক বিদেশি জুতো খুলে উদ্ভ্রান্তের মত দৌড়াতে লাগলেন। 'ফায়ার"ফায়ার' করে চীৎকার করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে গুহার ভিতরে এনে আগুনের কাছে বসানো হল। বাকিরা ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছেন। কেউ কেউ ঠাণ্ডা সহ্য না করতে পেরে কাঁদতে লাগলেন। আমাদের দলের স্থানীয়রা এগিয়ে গেলেন সাহায্য করতে। হাত-পা ঘষে দিলেন, গরম জলের জোগান দিলেন। সবাইকে বলা হয়েছিল জল থেকে বেরিয়েই যেন গামবুট খুলে পা ভালো করে মুছে মোজা পরে নেন। সবাই তা করলেও একজন সঙ্গে সঙ্গে গামবুট খোলেননি। পাঁচ-দশ মিনিট পরে খোলার চেষ্টা করতে গেলে সে জুতো আর পা থেকে বেরোয় না। ঠাণ্ডা জল পায়ের ভেতরে জমে পা আটকে দিয়েছে। আরো দু'জন মিলে প্রায় অনেকক্ষণ ধরে টেনে প্রায় যুদ্ধ করে সেই জুতো বার করলেন। এইসব কিছু দেখার পরে আমাদের সকলের সামনে টিবগুহার দিকে যাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেল। যাত্রীদলটির গাইড জানালেন যে ওঁরা আগের রাতে হোটং থেকে মাত্র একশো মিটার এগিয়েই ক্যাম্প করেছিলেন। এইটুকু রাস্তা আসতেই এরকম অবস্থা! না জানি সামনে আর কী কী চমক অপেক্ষা করতে পারে! আমরা তাই টিব হয়ে আমাদের এই ট্রেকের গন্তব্য নেরাক জলপ্রপাত যাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে আবার সুমোর দিকেই যাওয়া শ্রেয় মনে করলাম।

ব্যাগ গুছিয়ে যে পথে এসেছি সেই পথেই আবার চলা। সামনে না যেতে পারায় মনটা একটু খারাপ ছিল। কিছুদূরে গিয়ে যদিও সেটা উধাও হয়ে গেল। তীব্র আলোতে তুষারাবৃত পাহাড়-নদী ঝকঝক করছে। গাঢ় নীল আকাশে এক ফোঁটাও মেঘ নেই। রজত বললেন এইরকম পরিবেশে রাতের বেলা ভালো চাদর তৈরি হয়। আমাদের আর সে নিয়ে ভেবে আপাতত লাভ নেই। ফিরতি পথে অনেক যাত্রীদলকে দেখলাম সামনে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা কী করে যে গন্তব্যে পৌঁছবেন ঈশ্বরই জানেন।

গুঁড়ো বরফে পিচ্ছিলতা কমে যাওয়ায় পথ চলতে কোনো কষ্টই হল না। এই একদিনেই চাদর অনেকটা বদলে গেছে। কোথাও ভেঙে যাওয়া বরফ আবার জোড়া লেগেছে। কোথাও আবার আগেরদিনের হেঁটে আসা পথের কোনো চিহ্নই নেই। বরফ গলে জলের ধারা বইছে।আমাদের সঙ্গে সেরকম কাউকে ফিরতে দেখলাম না। ফাঁকা পথে অন্তহীন পাগলামি, লাফালাফি, নাচানাচি করলাম। কনকনে ঠাণ্ডা জলে চুমুক লাগাতেও ছাড়লাম না। এত কিছুর পরেও দুপুর একটার মধ্যে সুমোতে পৌঁছে গেলাম। সময় কাটাতে জাম্পেল আমাদের পাহাড়ের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ক্যাম্পের সামনে বয়ে চলা ছোট্ট ঝোরাকে অনুসরণ করতে করতে চড়াইয়ের পথে চললাম। এ যেন এক নতুন দুনিয়া! চারদিকে খয়েরি-হলুদ পাহাড় দিনের শেষ আলোকে যেন আগুনরঙা! মাঝখানে অনেকটা কড়াইয়ের মত ছোট উপত্যকায় আমরা। দূরে পাহাড়ের ওপরে ধরাছোঁয়ার বাইরে জুনিপার গাছের সারি। নিচে বুনো গাছেরা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। পাহাড়ি ঝোরার হাল্কা মৃদু শব্দ। কোথাও কোথাও পথ না থাকায় ঝোরা পার করে যেতে হচ্ছে। সেই ঝোরা এক জায়গায় এসে আধা জমে থাকা ছোট জলপ্রপাতের চেহারা নিয়েছে। আশেপাশে আর কেউ নেই। শুধু আমরা ক'জন যেন হাজার প্রতিকূলতা পেরিয়ে এসেছি রোমাঞ্চ উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক বিচিত্র দেখে গুপ্তধনের সন্ধানে। ভেবেই গায়ে কাঁটা দেয়।

সুমো অভিযান শেষে ক্যাম্পে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আগুনের ধারে গল্প আর গান করতে করতে রাত নেমে এল। জ্যোৎস্না আজকে ফেটে পড়ছে, টর্চেরও দরকার পড়ছে না। চাঁদের আলোয় চাদর যেন অপার্থিব! সেই রূপ অবর্ণনীয় - স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে চিরন্তন।

আহার সেরে ক্যাম্পে শুয়ে ভাবলাম আজও ভালোই ঘুম হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘুম ভেঙে গেল কাঁপুনিতে। সারা শরীর গরম, কিন্তু পায়ের আঙুল জমে বরফ। চারটে মোজা পরে পায়ে পা ঘষেও কোনো লাভ হল না। অগত্যা কাঁপুনি সহ্য করা ছাড়া রাস্তা নেই। আমার পাশে শোওয়া সহযাত্রীও কাঁপছেন। চেক করে নিলাম ক্যাম্পে কোথাও ফাঁকফোকর আছে নাকি যেখান থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকতে পারে। কিচ্ছু নেই। তাহলে কেন? হঠাৎ রজতের কথাটা মনে পড়ল। পরিষ্কার আকাশে চাদর জমে ভালো। সেই পরিষ্কার আকাশ আমাদেরকেও জমিয়ে দিচ্ছে। সকাল পর্যন্ত বাঁচব কি?

কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে বেঁচে গেলাম। সকালে জানতে পারলাম আগেরদিন রাতে সবারই একই অবস্থা হয়েছিল। তাপমাত্রা ছিল মাইনাস পঁচিশের কাছাকাছি। আজকেও বেশিদূর চলার নেই। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল যেখান থেকে সেখানেই আজকের ক্যাম্প। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও অনেক জায়গায় চাদর খুবই পাতলা হয়ে এসেছে। সাদা বরফের জায়গায় পাতলা নীলাভ বরফের স্তর দেখা যাচ্ছে। জাম্পেল বলল চাদর আর বেশিদিন থাকবে না। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই ভাঙতে শুরু করে দেবে। এ বছরের মত ইতি হবে চাদর ট্রেকের। ক্যাম্পে ফিরে রজত জানালেন টিব গুহার ওখানে প্রায় একশ ত্রিশজন আটকে গেছেন চাদর অনেকটা গলে যাওয়ায়।

যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেখানেই আজকে ক্যাম্প। চাদরের বুকে আজকেই অন্তিম দিন। না জানি পরে আবার আসতে পারব কিনা! শেষ মুহূর্তটুকু উপভোগ করার সময়। পরেরদিন সকালে ফেরার গাড়ি ধরার আগে জাঁসকারের ঠাণ্ডা জলে একবার ডুব না দিলেই নয়। সবাই মিলে সেই প্ল্যানই করছি চা-মুখরোচকের সাথে। তখনই আমাদের রাঁধুনি-পোর্টার-হেল্পাররা একটি ট্রেতে সবার জন্য নিয়ে এলেন জুনিপার গাছের সুগন্ধি পাতা। জুনিপার স্থানীয় মানুষদের কাছে এক অতি পবিত্র গাছ। ধুপগাছ নামেও পরিচিত এই গাছের পাতা বৌদ্ধরা ঘরে বা

বৌদ্ধমন্দিরে জ্বালিয়ে থাকেন সুগন্ধী ধোঁয়ার জন্য। ঘরে আসা অতিথিকে জুনিপারের পাতা দেওয়ার অর্থ তার মঙ্গলকামনা করা।
কোনো ভেদাভেদ না রেখে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বসলাম। জাঁসকারী মানুষগুলোর জীবনসংগ্রামের গল্প শুনলাম। তাঁরা কীভাবে কষ্ট করে জীবনযাত্রার রসদ সংগ্রহ করেন, ঠাণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পড়াশুনা করে অবস্থার উন্নতি করতেও তাঁদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। অনেক আবার সিয়াচেনে গাইড হিসাবেও কাজ করেছেন কয়েকমাস। সেখানে মোটা টাকার হাতছানি আছে। কিন্তু পরিবার, বাড়িঘর, পরিবেশ ছেড়ে কেউই বেশিদিন থাকতে চান না। সে যতই ভাঙাচোরা ঘরই হোক বা যত প্রতিকূল পরিবেশই হোক।
সারা যাত্রাপথে একজন মাঝবয়সী খর্বাকার জাঁসকারী পোর্টার আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর নাম থিল্লে। অন্য স্থানীয়রা যেখানে বহিরাগতদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতেন সেখানে থিল্লে খুব সহজেই আমাদের সাথে মিশে যেতেন, ইয়ার্কি-খুনসুটি করতেন, নাচগানে ভরিয়ে দিতেন। রজতের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব। সন্ধ্যার আসরে রজত থিল্লেকে বললেন, "চল্, আমারসঙ্গে আমার বাড়ি মানালিতে চল্।"
থিল্লে হেই হেই করে বলে উঠলেন, "না না, আমি জাঁসকার-লাদাখ ছেড়ে কোথাও যাবনা। এখানেই ঠিক আছি।"
রজত অবাক হলেন, "কেন? আরামসে থাকতে পারবি ওখানে।"
থিল্লে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "ওখানে সবকিছুই কেমন যেন জটিল। আমার এখানেই ভাল।"

গাড়ির হর্নে ঘোর ভাঙল। বাস চিনারপার্ক অতিক্রম করে হলদিরামের দিকে এগোচ্ছে।

~ *চাদর ট্রেকের আরও ছবি* ~

কলকাতার বাসিন্দা আই.টি. প্রফেশনাল অভিষেক মারিক ভালোবাসেন বেড়াতে। মূলতঃ ট্রেকিং। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তো বটেই, এমনকি বিদেশেও। নির্জন শান্ত পাহাড়ি পরিবেশ আর সেখানকার সরল মানুষজন তাঁকে আকর্ষণ করে। সেই টানেই বারবার ছুটে যান হিমালয়ে। এর পাশাপাশি স্থানীয় খাবার চেখে দেখতেও তিনি উৎসাহী। খাওয়া ছাড়া বেড়ানোর মানে আছে নাকি?

★★★★★
কেমন লাগল : - select -
Like 26 people like this. Be the first of your friends.
tell a Friend
মত দিয়েছেন : 5
গড় : 5.00

পুরীঃ বার্ধক্যের বারাণসী

তপন পাল

~ পুরীর আরও ছবি ~

প্রস্তাবনা
আমার জন্ম ১৯৫৯-এর জানুয়ারিতে। ২০১৯-এ আমার ষাট পূর্ণ হল। ৩১ জানুয়ারি অফিস থেকে ফেরার পথে দপ্তরের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজের গাড়িতে ফিরছিলাম। শীতের দিন; সন্ধ্যাকেই মনে হয় নিশুতি রাত। বাইপাস দিয়ে ফিরতে ফিরতে; ১৯৮০ থেকে ২০১৯ – এক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রার পরিসমাপ্তিতে - নিজেকে ভারমুক্ত ও স্বাধীন মনে হচ্ছিল। মনে পড়ল, স্ত্রীর পত্রের মৃণাল তাঁর চিঠি শেষ করেছিলেন 'তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন' লিখে। তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের,আত্ম-উন্মোচনের সেই শুরু। ঊনচল্লিশ বছর পর আমারও নিজেকে লাগল নিয়োগকর্তার 'চরণতলাশ্রয়ছিন্ন' – এইবার আমারও নিজেকে খুঁজে ফেরার পালা!

মৃণাল লিখেছিলেন 'তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র,আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে।' সত্যিই তো,মৃণাল তো পুরী গিয়েছিলেন! আমিও তো যেতে পারি!! স্ত্রীর পত্রের রচনাকাল শ্রাবণ ১৩২১; একশো চার বছর আগে। এই একশো চার বছরে বিশেষ কিছুই তো বদলায়নি - সমুদ্র সেই একরকমই আছে।

আমাদের পরিবারের রেওয়াজ হল বাড়ির সুখদুঃখের সব খবর - জন্ম, পরীক্ষা পাশ, চাকুরি প্রাপ্তি, বিবাহ...,শ্রীজগন্নাথ ও তদীয় ভ্রাতাভগিনীদের সশরীরে জানানো। আমার পুত্রের বিবাহ বা আমার পৌত্রীর অন্নপ্রাশনের সময় পারিবারিক হিতৈষী শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীকে নিমন্ত্রণপত্র আমিই দিয়ে এসেছিলাম; রাহাখরচসমেত। শ্রীজগন্নাথকে বলতে হয় অমুক দিনে আমার বাড়ি কাজ, অনেক লোকজন আসবে; তুমি একটু সকাল সকাল গিয়ে দেখাশোনা করো যেন কোনো গণ্ডগোল না হয়,সবকিছু ভালোয় ভালোয় মেটে। নির্দিষ্ট দিন ভোরবেলায় আমাদের পারিবারিক পাণ্ডামহারাজ মন্দিরে গিয়ে দীপ জ্বেলে শ্রীজগন্নাথকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আমাদের বাড়িতে ওইদিন তিনটি নিরামিষ 'মিল' রান্না হয় ওনাদের জন্য।
সেইজন্যেই যখন কাগজে পড়লাম যে মুকেশ আম্বানি শ্রীজগন্নাথকে মেয়ের বিয়ের কার্ড দিতে গেছেন, এবং বলেছেন যে এটি তাদের পারিবারিক রীতি, আশ্চর্য হয়েছিলাম। শ্রী আম্বানি ও আমার মধ্যে এত মিল! আমরা দুজনে প্রায় সমবয়সী, বছর দুয়েকের ছোটবড়, আমাদের দুজনেরই পিতা প্রয়াত হয়েছেন ২০০২ এর বর্ষায়; শুধু আমার পিতা যদি ওঁর পিতার মত কিছু রেখে যেতে পারতেন! আর অবসরের খবরটাও তো শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীকে দেওয়া দরকার!!
হাওড়া থেকে রাত সাড়ে দশটার সাবেকি হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস ধরে পরদিন সকালে পুরী: এমনটাই ইচ্ছে ছিল। অনেক অনেক বছর আগে, ধরণী যখন তরুণী ছিলেন, পুরীর সব হোটেলে চেক-ইন ছিল চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ সারাদিনে যখনই তুমি হোটেলে ঢুকবে, পরদিন সেই সময় অবধি একদিন বলে গণ্য হবে। তখন কলকাতা থেকে পুরী যাতায়াতের দুটি মাত্র রেলগাড়ি, হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস আর হাওড়া-পুরী শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস (হাওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জারকে আমি সযত্নে এই হিসাবের বাইরে রাখছি)। তারা দুজনেই পুরী পৌঁছায় সকালে,পুরী ছাড়ে রাতে। দিব্যি চলছিল; তারপর রেলগাড়ির সংখ্যা,বিশেষত দিনের রেলগাড়ির সংখ্যা বাড়তে পুরীর সব হোটেলেই এখন চেক ইন সকাল সাতটা-আটটা নাগাদ। তাই এই রেলগাড়িটিই পছন্দের; দুরন্ত বা শ্রীজগন্নাথ পুরী পৌঁছান কাকভোরে; হোটেলে পৌঁছে লাউঞ্জে বসে থাকতে হয়। কিন্তু বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেও বাতানুকূল দ্বিতীয় শ্রেণিতে দুটি নিচের শয্যা যোগাড় করা গেল না।
অগত্যা উড়োজাহাজ। সেখানে চাইলেই পছন্দমত আসন পাওয়া যায়।

প্রথম দিন
সাতটা কুড়ির ইন্ডিগো,উড়ান সংখ্যা ৬ই ৩৭৫,বিমানপোত এয়ারবাস এ৩২০ গোত্রের,পুরী যাওয়ার জন্য এই উড়ানটি আমার ভারি পছন্দের। এক ঘণ্টায় ভুবনেশ্বর, পুরীর আমাদের পরিচিত সারথিটিকে বলা ছিল, তিনি রথ নিয়ে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। হুশ করে দুঘণ্টায় আমরা পুরীতে, দেরি একটু হল, কারণ শ্রীমতী পাল সাক্ষীগোপাল মন্দিরে দাঁড়িয়েছিলেন।

উপকূলীয় ওড়িশার মন্দিরসমূহের পরিচালকদের দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে কোনদিন যদি রাশভারী গবেষণাপত্র লেখা হয়, তবে তার শীর্ষের নামটি যে এই মন্দিরের হবে, তাতে আমার সন্দেহ নাস্তি। মন্দিরে ঢুকতে হলে টাকা পয়সা, ঘড়ি আংটি, হার দুল সবই খুলে গাড়িতে রেখে যেতে হয়। কিন্তু না এসেই বা উপায় কী! মন্দিরটি পুরী যাওয়ার পথে, তা সে সড়কপথে, রেলপথে বা বিমানযোগে, যেভাবেই যান না কেন! আর শ্রীক্ষেত্র অবস্থিতিতে তথা শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যে পুণ্য অর্জিত হয়, তার হিসাব রাখেন ইনি। আপনি যে পুরী যাওয়ার নাম করে পুরীতেই গিয়েছিলেন, গোয়া বা ব্যাংককে নয়, শেষের সেদিনে সেই সাক্ষ্য দেবেন ইনি, তাই ইনি সাক্ষীগোপাল। সাক্ষীগোপাল অদর্শনে শ্রীজগন্নাথদর্শন অসম্পূর্ণ থাকে বলেই জনবিশ্বাস।

এবার একটু গালগল্প করা যাক। কবে কোন সুদূর অতীতে এক ব্রাহ্মণ পরিচারককে নিয়ে বৃন্দাবন যান তীর্থভ্রমণে। তথায় গিয়ে গুটিবসন্তে আক্রান্ত হন। পরিচারকটি সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলে প্রতিদানে কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁর রূপবতী কন্যার সঙ্গে পরিচারকের বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেন। গ্রামে ফিরে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে গেলে রক্ষণশীল সমাজের বাধা আসে। ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে শবরসন্তানের বিবাহ হয় কী করে! শাস্ত্রে অনুলোম, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহের সংস্থান আছে, কিন্তু প্রতিলোম, অর্থাৎ নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ নৈব নৈব চ। দীন ব্রাহ্মণ বলেন, কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি। গ্রামের মুরুব্বিরা পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, কোন্ সাক্ষী আছে তার!
কথা রাখতে ব্রাহ্মণ পুনরায় বৃন্দাবনে, মদনগোপালকে নিবেদন করেন তাঁর দুর্গতি। কথা দিয়ে কথা না রাখার পাপ অতীব গুরুভার। ভক্তকে সেই পাপ থেকে রক্ষা করতে মদনগোপাল ওড়িশা যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন; শর্ত, ব্রাহ্মণ আগে আগে যাবেন, মদনগোপাল পিছনে এবং কোনো অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখবেন না।

পথ চলা শুরু, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ব্রাহ্মণ শুনতে পান নিক্কণ, বুঝতে পারেন মদনগোপাল তাঁর অনুবর্তী। সহসা একদিন নিক্কণধ্বনি স্তব্ধ; কারণ বালুকাবেলায় পা বসে যাচ্ছে, নিক্কণধ্বনি হবে কী করে? তবে ব্রাহ্মণ বুঝতে পারেননি, সংশয়ে ঘাড় ঘোরাতেই মদনগোপাল প্রস্তরীভূত। বললেন আমি আর যাবোনা, তোমার গ্রামের লোকজনদের এখানেই ডেকে আনো, সাক্ষ্য দেবো। সেই থেকে সাক্ষীগোপাল, সাক্ষ্যপ্রদানকারী মদনগোপাল। আদতে উত্তরভারতের দেবতা বলেই সম্ভবত এখানকার ভোগ পুরোটাই গোধূমজাত, ধান্যজাত নয়; বিষ্ণুমন্দিরের রীতিঘরানায় যা এক বিরল ব্যতিক্রম।

গল্পটি আদতে সামাজিক উত্তরণের। ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করে শবরবালকটি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেন ও নব্যস্থাপিত মন্দিরের পূজারীর পদে বৃত হন। তাঁর বংশধররা আজও ওই মন্দিরের সেবাইত।

অবশেষে পুরী; নিম্নবিত্ত বাঙালির আনন্দ নিকেতন, তার সব পেয়েছির দেশ, তার স্বতঃস্ফূর্ততার উৎসমুখ। পুরীতে আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো; পাথর স্মৃতি অর্থে। বিবাহোত্তর চৌত্রিশ বছরে এতবার এসেছি, তার স্মৃতি আক্ষরিক অর্থেই পথে পথে ছড়ানো। পথ চলতে চলতে শ্রীমতী পাল হুট করে দাঁড়িয়ে গেলেন,'মনে আছে,সেই একবার বৃষ্টি এলো, আমরা এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম', বা 'মনে আছে, এই দোকানে একবার তুমি চা শেষ করে গেলাসের নিচে মরা মাকড়সা পেয়েছিলে', বা 'মনে আছে, এই হোটেলে আমরা একবার প্রচণ্ড ঝাল মাংস খেয়েছিলাম।'

অবস্থিতি সেই সৈকতলগ্না শতাব্দীপ্রাচীন হোটেলে। তাঁরা মহার্ঘ একটি ঘর আমাদের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকেই বিছানায়; উফ, ঠিক এইরকমই একটা জীবন তো চেয়েছিলাম; নির্দায়, নির্ভার। যেখানে নিজের মত করে বাঁচতে পারবো, দিবারাত্র পেটের চিন্তায় দিন যাবে না। আমার পিতা যদি আমার জন্য পাঁচশো বিঘা ধানজমি রেখে যেতে না পারেন, সেটি তাঁর ব্যর্থতা; আমাকে তার দায় টেনে জীবনের ...
উনচল্লিশটা বছর গাধার খাটুনি খাটতে হবে কেন? অবসরের প্রাক্কালে কিছু শুভানুধ্যায়ী অবসরোত্তরকালীন একটি চাকরির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। শুনে মর্মাহত হয়েছিলাম। এনারা আমাকে কি ভাবেন! আমি কি চটকলের বদলি শ্রমিক? অর্ধেক বেতনে ঠিকে কাজ করতে যাব কেন?

স্নানাহারান্তে ভোঁসভোঁস করে নিদ্রা। কতদিন দুপুরে ঘুমোইনি গো! ঘুম থেকে উঠে, ঘরেই চা বানিয়ে খেয়ে দুজনে একসঙ্গে বেরোলাম; যদিও গন্তব্য আলাদা। শ্রীমতী পাল যাবেন মন্দিরে, ধ্বজা পরিবর্তন দেখতে; এবং যথেষ্ট আগে না গেলে পছন্দসই বসার জায়গা পাওয়া যাবে না। আমি যাবো স্বর্গদ্বার থেকে সৈকত ধরে পশ্চিমে অনেকখানি হেঁটে মোহনা। রঘুরাজপুরের কাছে ভার্গবী নদী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ধউদিয়া নদী সেখানে সমুদ্রসন্নিধানে। তিনি এতই হ্রস্ব যে ভূগোলবইয়েও তার নাম নেই। ভার্গবী নিজেও খুব একটা বড় নদী নয়, কুয়াখাই নদী থেকে নির্গত হয়ে চিলিকায় তার পথ চলার সমাপ্তি। নির্জন মোহনায় হাঁটুজলে নেমে ঝিনুক কুড়োতে আমার ভারী ভালো লাগে। তবে কুড়ানোর শেষে তাদের আবার সমুদ্রেই ফিরিয়ে দিই। ১৯৮৬ থেকে যিনি প্রতিবছর পুরী যাচ্ছেন, এবং ২০১৩ থেকে প্রতি মাসে, তিনি যদি কুড়ানো সব ঝিনুক বাড়ি আনেন তাহলে বাড়িতে ঝিনুকদের রেখে বাড়ির লোকগুলিকে হিমালয়ে যেতে হয়।

সেখানে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে মন্দিরে, শ্রীমতী পাল সন্নিধানে। ধ্বজা পরিবর্তন পুরী মন্দিরের একটি রীতি। মন্দিরের শীর্ষে ছত্রিশ ফুট পরিধির অষ্টধাতুর বিষ্ণুচক্র, নীল আভাসের জন্য তার আর এক নাম নীলচক্র; শ্রীজগন্নাথ যে শ্রীমন্দিরেই আছেন লোককে তা জানাতে মন্দির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রতিদিন অপরাহ্ণে এক সেবক মন্দিরের চুড়োয় উঠে সেখানে নতুন কুড়ি মিটার দীর্ঘ ত্রিকোণ উজ্জ্বল পীতরাগ কেতন, তাইতে অলক্তরাগে শ্রীজগন্নাথের লোগো, বাঁধেন। প্রতিদিনকার পতাকা প্রতিদিন তৈরি হয়, চোল পরিবারের কোনও সাবালক পুরুষ সদস্য সব নিয়ম মেনে সকালে তা তৈরি করেন। চোল পরিবারের সদস্যরা পুরীর রাজার আদেশে বিগত আটশো বছর করে এই কাজ করে আসছেন; এ কাজে তাদের নিঃসপত্ন অধিকার। প্রতি একাদশীতে সেই সেবকের হাতে থাকে দীপ। নিরানব্বইয়ের সুপার সাইক্লোন বা তেরোর সাইক্লোন ফাইলিং এসেছে, গেছে, ধ্বজা পরিবর্তন তাতে বিঘ্নিত হয়নি। পুরী মন্দির পরিচালনার গাইডবই মদলপঞ্জীতে বলা আছে কোনও কারণে একদিন ধ্বজা পরিবর্তন না হলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আঠারো বছর মন্দির বন্ধ রাখতে হবে।

এই রীতিটি দর্শন নাকি পুণ্যের কাজ। আমি মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং অং বং চং। আমার কাছে ভগবানের চেয়ে মানুষ বেশি কৌতূহলজনক। একটি মানুষ যখন সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে তরতর করে সুউচ্চ মন্দিরশীর্ষে উঠে যান, তখন দেবতার মাহাত্ম্যের চেয়ে মানুষের ক্ষমতাই আমার কাছে বেশি প্রতীয়মান হয়। তবে হিসাবশাস্ত্রের ছাত্র তো। ভাবতে চেষ্টা করছিলাম পুরীর রাজার আদেশবদ্ধ এই অধিকারের আর্থিক মূল্য আজকালকার বাজারে কত হতে পারে! নামিয়ে আনার পরে মূল পতাকা, অপরাপর পতাকা, এমনকি পতাকাখণ্ডও অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হতে দেখলাম।

দ্বিতীয় দিন।

দ্বিতীয় দিন সকালটা কাটলো মন্দিরে,পুজাআর্চায়। হিন্দু দেবলোকের সদস্য-সদস্যারা যুগলে দেখা দিতেই অভ্যস্ত; হর-পার্বতী বা লক্ষ্মী-জনার্দন যেমন। কিন্তু সখা শ্রীজগন্নাথ দেখা দেন ভ্রাতাভগিনী সমভিব্যাহারে। তাহলে একটা গল্প বলি শুনুন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা, 'অনেক তোমার টাকাকড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি, অনেক অশ্ব অনেক করী - অনেক তোমার আছে ভবে'। তবু,'বেচারা রাজার ভারী দুখ'। 'দুঃখ কীসে হয়? অভাগার ভাবে জেনো শুধু নয় - যার ভাণ্ডারে রাশি রাশি সোনাদানা ঠাসাঠাসি তারও হয়, জেনো সেও সুখী নয়।।' শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষী; ভাগবৎ পুরাণবর্ণিত রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নগ্নজিতী, ভদ্রা, লক্ষণা। তদসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রার ঘোরে প্রায়শই রাধা রাধা বলে কেঁদে ওঠেন। ঘুমের ঘোরে আমি কোনও মহিলার নামোচ্চারণ করলে শ্রীমতী পাল নির্দ্বিধায় আমাকে খাট থেকে ঠেলে ফেলে দিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জগদ্ধারক, খাটও তাঁর, ভূমিও তাঁর। তাঁকে আর শয্যাচ্যুত করে কে? অথচ মহিষীরা মহাবিব্রত। তাঁরা অস্পষ্ট শুনেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে মামী, বয়সে বড় বৃন্দাবনের আয়ানপত্নী রাধার কথা। কিন্তু তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাঘোরে নেবেন কেন? যুগপৎ বিরক্ত ও কৌতূহলী হয়ে তাঁরা একদিন বলরামমাতা রোহিণীকে ধরলেন। তিনি বৃন্দাবনলীলা দ্বারকালীলা উভয়েরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কিন্তু সন্তানের ইন্টুমিন্টু বিবৃত করতে কোন্ জননীর ভালো লাগে? রোহিণী রাজি হলেন না। মহিষীরাও নাছোড়বান্দা - বিদগ্ধা সত্যভামার উপর ভার পড়ল রোহিণীকে রাজি করানোর।
অবশেষে জননী রোহিণী রাজি হলেন; তবে ছেলেদের সামনে নয়। বলরাম ও কৃষ্ণ যখন রাজসভায় রাজকার্যে ব্যস্ত থাকবে সেই মধ্যাহ্নসময়ে রোহিণীমাতা পুত্রবধূদের গল্প শোনাবেন। রোহিণীমাতা গল্প শুরু করলেন। পাছে বলরাম কৃষ্ণ এসে পড়ে তাই সুভদ্রাদেবীকে দাঁড় করালেন দরজা পাহারা দিতে।

সুভদ্রা দুয়ারে বসে আছেন,রোহিণীমাতা বলছেন বৃন্দাবনের দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসের সেই অপূর্ব লীলাকথা; মহিষীরা মগ্নআকুল হয়ে শুনছেন। রাধানামের এমত মহিমা যে বলরাম ও কৃষ্ণও আর রাজসভায় বসে থাকতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন 'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাংহৃদয়ে ন চ। মদভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।" আমি যোগীদের হৃদয়েও থাকি না,বৈকুণ্ঠেও থাকি না' আমার ভক্তরা যেখানে আমার লীলাকীর্তন করে সেখানেই আমি থাকি। তাঁরা রাজকার্য ছেড়ে চলে এলেন ব্রজকথা শুনতে। সুভদ্রাদেবী তাঁদের পথ আটকালেন। সুভদ্রাদেবীর দুদিকে দুভাইয়ে দাঁড়িয়ে দরজা থেকেই তাঁরা ব্রজকথা শুনতে লাগলেন। বারোজনেই রাধাকথায় বিহ্বল। শুনতে শুনতে,ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ায়,দুভাইয়েরই ভাব উপস্থিত হল,দেখাদেখি সুভদ্রাদেবীরও। তাঁদের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, ঘনঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে গেল। দের্বষি নারদ,ওই কাজকাম না থাকলে যা হয় আর কি,ঘুরতে ঘুরতে তখন ওইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কাণ্ডকারখানা দেখতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ক্রমে গল্প ফুরালো, নটেগাছটিও মুড়ালো। সব আবার আগের মত হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে বললেন- নারদ তুমি এখানে কি করে গো! নারদ তখন গদ্গদ,'আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না!' ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু,তোমরা ভাইবোনে এবার থেকে এই রূপেই ভক্তদের দেখা দিও। আর জানেনই তো! ভগবান আবার ভক্তদের কথা ফেলতে পারেন না। ভক্তদের তিনি এতটাই ভালোবাসেন যে নিয়ম করেছেন পুরীতে অভুক্ত থেকে বিগ্রহ দর্শন করা অকাম্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে একটি মজার কথা আছে। অপাণিপাদো জাবানো গ্রহীতাপশ্যত্যচ ক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্নঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তাতমাহুরগগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।। - তাঁর লৌকিক হস্ত নাই,অথচ তিনি সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন। তাঁর পদ নাই অথচ সর্বত্রই চলেন। তাঁর চোখ নাই অথচ সবই দেখেন। কান নাই কিন্তু সবই শোনেন।

বিলম্বিত প্রাতরাশের পর সমুদ্রের সম্মুখে কুড়ি টাকা ঘণ্টা দরে চেয়ার ভাড়া নিয়ে বসা; দুপুরে খেয়ে ঘুম। শ্রীজগন্নাথ মন্দির ছাড়াও পুরীতে ছোট বড়, প্রধান অপ্রধান, শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব গাণপত্য হাজার মন্দির ছড়িয়ে। তীর্থস্থানরূপে পুরীর ক্রমবিকাশ ও সর্বজনগ্রাহ্যতা এবং শহরটির চরিত্র বুঝতে হলে সেগুলিতে একবার করে ঢুঁ মারা অত্যাবশ্যক। অপরাহ্ণে অটোয় চেপে সেই কাজে বেরিয়ে পড়া গেল।

হাসপাতাল থেকে পুরী ভুবনেশ্বর রোড ধরে আঠারোনালা সেতুর দিকে যেতে বাঁয়ে, কুমোরপাড়া এলাকায় পূর্বমুখী অলমচণ্ডী মন্দির। এই চতুর্ভুজা দুর্গাদেবী অদিশিয় অষ্টচণ্ডীর (বটমঙ্গলা,বিমলা,সর্বমঙ্গলা,অর্ধসানি,অলম্ব,দক্ষিনাকালিকা,মরীচি ও হরচণ্ডী) অন্যতমা। মন্দিরটি আকারে ছোট হলেও গুরুত্বে বড়, নবকলেবরের আগে শ্রীজগন্নাথ মূর্তি নির্মাণার্থে নীত গাছের গুঁড়িভর্তি গরুর গাড়ি এই মন্দিরের সমুখের রাস্তা দিয়েই আনা হয়। পুরীর রাজা গজপতি ও সাধু সন্ন্যাসীরা এই মন্দিরে সমবেত হয়ে সেই দারু গ্রহণ করেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সপ্তপুরী পূজানুষ্ঠানের সঙ্গেও এই মন্দির জড়িত। সপ্তপুরী অমাবস্যার দিন শ্রীজগন্নাথমন্দির থেকে সপ্তপুরীকে এই মন্দিরে ভোগ খেতে পাঠানো হয়। মন্দির অভ্যন্তর দশমহাবিদ্যার ম্যুরালশোভিত, প্রবেশপথে নবগ্রহ।
অষ্টচণ্ডীর মতই আছেন অষ্টশম্ভু, এনারা শ্রীজগন্নাথদেবের অভিভাবক। পুরী শহরের আট দিকে বসে তাঁরা শহরকে ও শহরের অধিবাসীদের সম্ভাব্য সকল বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। এঁরা হলেন মার্কণ্ডেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, বিল্বেশ্বর, কপালমোচন, বালেশ্বর, ঈশানেশ্বর ও পাতালেশ্বর। কলিঙ্গধাঁচের ধূসর বেলেপাথরের অষ্টচণ্ডীর ছোট মন্দিরটি দশম শতকের, গোপীনাথপুরের তিয়াদিসাহি এলাকায়, নানাবিধ উপরত্নের আটরঙের আটটি শিবলিঙ্গ; কাছে একটি গণেশ মন্দির। এই মন্দিরটিতে এখন আর পূজার্চনা হয় না।
হরচণ্ডীসাহিতে যমেশ্বর মন্দির রাস্তা থেকে অনেকখানি নিচে, □সাধ্য সিঁড়ি ভেঙে নামতে হয়, এবং উঠতে। অতি পুরানো মন্দির, খুব একটা জনপ্রিয় নয়। এমনিতেই নাম যমেশ্বর, লোকবিশ্বাসে মহারাজ যম ও তদীয় দূতদের এখানে ঘোরাফেরা। পারিপার্শ্বিকের পরিবেশও কিঞ্চিৎ ভুতুড়ে – মাটি থেকে অনেকখানি নিচে হওয়ায় কেমন গা ছমছম ভাব – লোকে তাই এই মন্দির এড়িয়ে চলে।
যমেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে অলাবুকেশ্বর। স্বয়ং রামচন্দ্র নাকি এখানে লাউ দিয়ে পুজা দেওয়ার প্রচলন করেন। অদ্যাবধি মহিলারা সন্তানকামনায় এখানে লাউ দিয়ে পূজা দেন। অলাবুকেশ্বর মন্দিরের পাশেই কপালমোচন মন্দির। পবিত্র মণিকর্ণিকা কুণ্ড তার গায়েই। সেখানে লোকনাথ মন্দির। এই লোকনাথ ব্যক্তি লোকনাথ নন, শিব লোকনাথ। ইনি, জানা গেল, আরোগ্যদায়ী।
অর্ধসানি বা মাসিমা মন্দিরটি বড়রাস্তার উপরেই। রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথ ভ্রাতাভগ্নী সমভিব্যাহারে শ্রীমন্দিরের পূর্বদ্বার থেকে যাত্রা শুরু করে গ্র্যান্ড রোড ধরে গজপতি রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে তাঁর মাসির বাড়ি গুন্দিচা মন্দিরে যান। এই যাত্রাপথের ঠিক মাঝখানে,বাঁহাতে,অর্ধসানি বা মাসিমা মন্দির। ইনি শ্রীজগন্নাথ ও তদীয় ভ্রাতাভগ্নীদের আর এক মাসি; গরিব মাসি, তাই শ্রীজগন্নাথ তাকে অতিথিপরিচর্যার দায়ে বিড়ম্বিত করতে চান না। তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষণিকের যাত্রাবিরতি করেন; গরিব মাসিমাও রাজা বোনপোর আগমনে পরমপ্রীতা হয়ে তাঁকে পোড়া পিঠে খাওয়ান।

আঠারোনালা সেতুটি পুরীর কতিপয় ধর্মসম্পর্কহীন দ্রষ্টব্যের একটি। অদিশার সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের ইতিহাস শহরে ঢোকার মুখের এই সেতুটির প্রতিটি ইটে বিবৃত। পঁচাশি মিটার লম্বা ও এগারো মিটার চওড়া সেতুটি মন্দুপুর জলধারার উপর গঙ্গারাজ বংশের রাজা ভানুদেব কর্তৃক নির্মিত ত্রয়োদশ শতকে। আঠারোটি খিলান সাত থেকে ষোলো ফুটের ব্যবধানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আজও শহরবাসীর দৈনন্দিন পরিবহনের দাবি মেটাচ্ছে। এই সেতুর পাশের একটি বিন্দুতে দাঁড়ালে দূরের শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখা যায়। চৈতন্যদেবের শ্রীক্ষেত্রবাসের প্রথম পর্যায়ে, যখনও তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার পাননি, তিনি নাকি এখানে দাঁড়িয়ে দূরের শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখতেন, দেখে আকুল হতেন। হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে। গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে।

শহরের উপকণ্ঠে, জাতীয় সড়কের ওপরে ত্রয়োদশ শতকের বটমঙ্গলা মন্দির। আদিপিতা ব্রহ্মা একবার নাকি বিপুল শূন্যতার মাঝে ঘোর অন্ধকারে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তখন মা মঙ্গলা তাঁকে হাত ধরে শ্রীজগন্নাথের কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। ওড়িয়া ভাষায় বট শব্দের অর্থ পথ। বটমঙ্গলা অর্থাৎ পথের দেবী। ১৮৯৭-এ পুরী রেলস্টেশন চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত পুরী যাওয়ার পথ ছিল কলকাতা-পুরী জগন্নাথ সড়ক। চৈতন্যদেব, নানক, কবীর এই পথ দিয়েই জগন্নাথদর্শনে গিয়েছিলেন। সেই যুগে পুণ্যার্থীরা শহরে ঢোকার আগে এই মন্দিরে পুজো দিতেন, দিয়ে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যেতেন। নবকলেবরের সময় মূর্তিনির্মাণকল্পে গাড়িভর্তি নিমকাঠ মন্দিরে আনা হয়। সেই গাড়িগুলি যাত্রাবিরতি করে এই মন্দিরে। পাশ ও অঙ্কুশধারিণী দ্বিভুজা দেবী ত্রিনেত্রা, পদ্মাসনা, স্মিতবদনা; সঙ্গে দশমহাবিদ্যা। নিচু ছাদের ছোট মন্দিরটি ভারি জমজমাট। মাথা নিচু করে ঢুকতে হল। মন্ত্রোচ্চারণ আর ঢোকার মুখে ঝোলানো অসংখ্য পেতলের ঘন্টার সম্মিলিত ধ্বনি, ধূপধোঁয়া-ফুলমালা...

মা বনদুর্গা রয়েছেন মনিকর্ণিকা সাহি রোডে; সেখান থেকে সৈকত সমান্তরাল যে রাস্তাটি পুর্বে বিস্তৃত তার নাম চক্রতীর্থ রোড। চক্রতীর্থ একটি ছোট পুকুর,তবে মাহাত্ম্যে বড়।.কাছাকাছি সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির,তার উত্তরে চক্রনারায়ণ মন্দিরে শোভা পাচ্ছেন লক্ষ্মী-নৃসিংহ। চক্রনারায়ণ মন্দিরের পশ্চিমে দারিয়া মহাবীর মন্দিরে বসে আছেন হনুমানজি।

নরেন্দ্র সরোবরের গায়ে চারা গণেশ বসে আছেন। শ্রীজগন্নাথমন্দির নির্মাণপ্রারম্ভকালে সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নবিনাশক গণেশদাদার পুজার সূত্রপাত। সেই অর্থে ইনি অতিপ্রাচীন। বালুকাময় পুরীতে মস্ত পাথর খুব সুলভ নয় ফলে মনে করা যেতেই পারে যে প্রস্তরখণ্ডগুলিকে দূর থেকে আনা হয়েছিল এবং জলপথে - চিলিকা হয়ে অথবা মহানদী হয়ে নরেন্দ্র সরোবরে। ওড়িয়ায় চারা শব্দের অর্থ ফাঁস। প্রস্তরখণ্ডগুলি সম্ভবত ফাঁস বেঁধে ওপরে তোলা হত,এখনও রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথকেও ওমনিভাবেই তোলা হয়।

বালিসাহিতে পূর্বমুখী দক্ষিণাকালিকা মন্দিরে চতুর্ভুজা দক্ষিণাকালিকা মাতা শবারূঢ়া, রুধিরপানরতা। ইনি প্রভূত দাক্ষিণ্যময়ী এবং শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহের অধ্যক্ষা।

শ্রীজগন্নাথের মাসির বাড়ি গুন্দিচা মন্দির সুন্দরচালা এলাকায়। লোকবিশ্বাসে সুন্দরচালা বৃন্দাবনসম, এবং নীলাচল, শ্রীজগন্নাথমন্দির যেখানে,দ্বারকাসম। এটি শ্রীজগন্নাথের বাগানবাড়ি রূপেও খ্যাত, কারণ প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরটির অভ্যন্তরে সযত্নলালিত চমৎকার উদ্যান। ধূসর বেলেপাথরের কলিঙ্গ দেউলস্থাপত্যের মন্দিরটিতে চারটি অংশ - বিমান (মূলমন্দির), জগমোহন (দর্শনার্থীদের দাঁড়াবার জায়গা), নাটমণ্ডপ (উৎসব, আচার প্রতিপালনের স্থান) ও ভোগমণ্ডপ; সেখান থেকে একটি সরু পথ দিয়ে গিয়ে রান্নাঘর। গুন্দিচা রাজা ইন্দ্রদুম্নের মহিষী, তিনিই এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। মতান্তরে গুন্দিচা গুটিবসন্তের স্থানীয় লৌকিক দেবী। শ্রীজগন্নাথ এই মন্দিরে পশ্চিমদ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন ও পূর্বদ্বার দিয়ে নির্গত হন। রথযাত্রার নয়দিন ব্যতিরেকে সারা বছর মন্দিরটি ঘুমিয়ে থাকে, এবং এখানকার পাণ্ডা মহারাজরা টাকাপয়সার জন্য দর্শনার্থীদের চূড়ান্ত অপদস্থ করতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সেবাইতরা দইতা, কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণরাই মন্দির পরিচালনা করেন। রথযাত্রার পূর্বদিন থেকে পুনর্যাত্রা অবধি, এই দশদিন এই মন্দির জেগে ওঠে, গুন্দিচা মার্জনা (চৈতন্যদেব প্রবর্তিত রথযাত্রার পূর্বদিন), হেরা পঞ্চমী (রথযাত্রার পঞ্চম দিন), দক্ষিণ মোড় (রথযাত্রার ষষ্ঠ দিন), রাসলীলা (রথযাত্রার ষষ্ঠ থেকে নবম দিন), সান্ধ্যদর্শন (পুনর্যাত্রার পূর্বদিন) ইত্যাদি নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়। শ্রীচৈতন্যদেব নাকি এই মন্দিরেই অপ্রকট হয়েছিলেন, এবং কথা দিয়েছিলেন যে প্রতি বছর রথযাত্রায় তিনি গুন্দিচা মন্দিরে অবতীর্ণ হবেন। সেই বিশ্বাসে বঙ্গীয় বৈষ্ণবরা রথযাত্রায় দলে দলে এই মন্দিরে আসেন। 'অদ্যপি সেই লীলা করে গোরা রায়, কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।'

গুন্দিচা মন্দিরের পাশেই দশাবতার মন্দির। অক্লেশ-কেশব, মুগ্ধ-মধুসূদন, স্নিগ্ধ-মধুসূদন-এর কবি জয়দেব নাকি এখানে থাকতেন। গুন্দিচা মন্দিরের পশ্চিমে সিদ্ধ মহাবীর হনুমানের ছোট মন্দির। কবি তুলসীদাস নাকি এখানে থাকতেন।
গুন্দিচা মন্দিরের প্রাকারের উত্তরপূর্বে ত্রয়োদশ শতকের নরসিংহ মন্দির; পুরীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মস্থানরূপে খ্যাত। রাজা ইন্দ্রদুম্ন নারদমুনির সহায়তায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন; তাই এই মন্দিরের আর এক নাম যজ্ঞ-নরসিংহ মন্দির। তবে সাত্ত্বিক বৈষ্ণবজন কিভাবে একশো ঘোড়ার মৃত্যুর কারণ হলেন ও তার জন্য তাঁদের কোনো অনুতাপ অনুশোচনা অপরাধবোধ হয়েছিল কিনা তা জানা গেল না। নরসিংহ হাঁটু মুড়ে বসা, নরসিংহের উপরের ডানহাতে চক্র, উপরের বামহাতে শঙ্খ, নিচের দুইহাত হাঁটুর উপর প্রসারিত। বামে লক্ষ্মীদেবী। বেদীতে গরুড়। এই মন্দির শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সাথে নানা ক্রিয়াকলাপে সম্পৃক্ত। শ্রীজগন্নাথকে প্রদত্ত মালা, ফুল এই মন্দিরে নীত হয়। নবকলেবরের সময় মূর্তিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় এই মন্দিরের সহযোগ থাকে।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দু'কিলোমিটার দূরে, দণ্ডিমালাসাহিতে পঞ্চদশ শতকের ষোড়শ ঘাটের নরেন্দ্র সরোবর, জল রাস্তা থেকে প্রায় দশ ফুট নিচে। সরোবরের কেন্দ্রস্থলে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনমণ্ডপ। সেই সুবাদে চন্দনসরোবর নামে খ্যাত। পুরীর পঞ্চতীর্থের অন্যতম এই সরোবর। বাকিরা হলেন সমুদ্র, গুন্দিচা মন্দিরের নিকটবর্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মণিকর্ণিকা, মার্কণ্ড সরোবর ও শ্বেতগঙ্গা ।

শ্যামাকালীচক থেকে তিয়াদিসাহি যেতে পূর্বমুখী শ্যামাকালীমন্দির। পুরীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এই কালীমন্দিরে আসীনা চতুর্ভুজা শ্যামাকালী, দশমহাবিদ্যার প্রথমা। চতুর্ভুজা বিমলা ও সর্বমঙ্গলা দেবীর বামে। ইনি পুরীর রাজপরিবারের কুলদেবী, তাই দেবীর বেদীতে রাজচিহ্ন প্রোজ্জ্বল। অদ্যাবধি, পুরীর নতুন রাজা অভিষেকের পর সর্বপ্রথমে এই মন্দিরে আসেন আরাধনার্থে। ল্যাটেরাইটের মন্দিরটি পুরীর রাজপরিবারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন।

সপ্তমাতৃকা - ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, অন্দ্রি, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহি ও চামুণ্ডা - থাকেন মার্কণ্ড সরোবরে। বৈষ্ণবীয় পুরীতে শাক্ত দেবীদের আধিপত্য মনে করিয়ে দেয় পুরী একান্নপীঠের অন্যতম শাক্ততীর্থ। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলা, তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলভদ্রের স্ত্রী,সেইসূত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের বৌঠান। অথচ শাক্তমতে বিমলাদেবীর ভৈরব শ্রীজগন্নাথদেব। অদিশার এক বাসচালক বাবুঘাটে আমাকে একবার বলেছিলেন,'জানো তো! একান্নপীঠের মধ্যে চারটে মহাপীঠ।' 'তাই নাকি! কোন কোনটে গো'! 'তোমাদের কালীঘাট, অসমের কামাখ্যা, পুরীর মা বিমলা, আর তারাতারিণী'। 'ও! জানো তো! তারাতারিণী অনেক বছর আগে একবার গিয়েছিলাম,আবার যেতে ইচ্ছে করে,কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।' প্রত্যুত্তরে সে এক অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিল। 'জানো! অদিশার সব বাসমালিক,সব বাসকর্মচারী তারাতারিণীর ভক্ত। তোমার পুজো পাঠাবার থাকলে এই বাবুঘাটে এসে,অদিশার যেকোনো বাসড্রাইভারের হাতে নারকোল আর টাকা দিয়ে দেবে। নিশ্চিন্ত থাকো, দশটা বাসড্রাইভারের হাত ঘুরে তোমার পুজো ঠিকই ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে'।

হরচণ্ডসাহিতে টোটা গোপীনাথের মন্দির, চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানরহস্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বাঙালির সর্বাপেক্ষা প্রিয় কন্সপিরেসি থিয়োরির পীঠস্থান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত অঙ্গন, মস্ত নাটমণ্ডপ, তার ভিতরের দেওয়াল ও ছাদ ফ্রেস্কোশোভিত। বাইরের দেওয়ালে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাসমূহ ম্যুরালে বিবৃত। টোটা গোপীনাথ মাঝে শোভা পাচ্ছেন,বামে ত্রিভঙ্গা শ্রীরাধিকা বীণাবাদনরতা,দক্ষিণে বংশীবাদিকা ললিতাক্ষী; এবং দুজনেই কৃষ্ণা। বামের বেদিতে শোভা পাচ্ছেন বলরাম, সঙ্গে বামে রেবতী, দক্ষিণে বারুণী। ডাইনের বেদিতে শোভা পাচ্ছেন গৌরাঙ্গদেবের পিতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র মামু ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন। সকাল সাতটায় গেলে, পুরোহিত মশাইকে যথাযথভাবে বলতে পারলে, তিনি আপনাকে গোপীনাথ বিগ্রহের ডান হাঁটুর নিচে একটি স্বর্ণালী দাগ দেখাবেন। মহাপ্রভু ওই ছিদ্রপথে টোটা গোপীনাথ বিগ্রহে বিলীন হয়েছিলেন, এমনটিই জনশ্রুতি। কৃষ্ণবিরহকাতর চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-অন্বেষণে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলে কৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে চলে আসেন। চৈতন্যদেব মাটির নিচে পাওয়া বিগ্রহের নামকরণ করেন গোপীনাথ, এবং বাগানের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল বলে টোটা, উদ্যানের ওড়িয়া প্রতিশব্দ। চৈতন্যদেব গদাধর পণ্ডিতকে ক্ষেত্র সন্ন্যাসপ্রদান করেন, যাতে গদাধর পণ্ডিত ওইখানে বসবাস করে টোটা গোপীনাথের পরিচর্যা করতে পারেন।
গোপীনাথ এখানে দণ্ডায়মান নন, ব্যতিক্রমীভাবে উপবিষ্ট। এ নিয়েও গল্প; আদিতে গোপীনাথ দণ্ডায়মানই ছিলেন, তারপর গদাধর পণ্ডিত কালক্রমে বৃদ্ধ হলেন, তখন তিনি আর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দণ্ডায়মান গোপীনাথকে মালা পরাতে পারেন না। গোপীনাথ নাকি আবার ভক্তের কষ্ট সইতে পারেন না। তাই,গদাধর পণ্ডিতের সুবিধার জন্য, তিনি ধপ করে বসে পড়লেন।

বিকালে আবার সমুদ্রের সম্মুখে।

তৃতীয় দিন।
আমাদের বিশ্বস্ত সারথির সঙ্গে বেরিয়ে পড়া সকাল সকাল। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি যুবক কাজের খোঁজে পশ্চিমে যেতেন। আমার নিজেরই বড়জ্যাঠা ম্যাট্রিক দিয়ে চলে গিয়েছিলেন জামালপুরে, সে আজ থেকে একশো বছর আগের কথা। তারপর সেখানেই প্রবাসী বাঙালি বড়বাবুর মেয়েকে বিবাহ করে সেখানেই স্থিতি। তাঁর ভাইপো আমি, আমারও তাই পশ্চিমে যেতে সাধ।
প্রথম গন্তব্য অলরনাথ। স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর জ্বর আসে। রাজবৈদ্য তাঁর চিকিৎসা করেন। অসুস্থতার এই পর্যায়টি 'অনসর'নামে পরিচিত। এই সময় ভক্তেরা দেবতার দর্শন পান না। তাঁদের দর্শনের জন্য বিগ্রহের পরিবর্তে মূল মন্দিরে তিনটি পটচিত্র রাখা হয়। এই সময় ভক্তেরা ব্রহ্মগিরিতে অলরনাথ মন্দিরে যান। তাঁরা বিশ্বাস করেন, অনসরপর্যায়ে জগন্নাথ অলরনাথ রূপে অবস্থান করেন। রাজবৈদ্যের আয়ুর্বৈদিক 'পাঁচন' খেয়ে একপক্ষকালের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি প্রমোদভ্রমণে মাসির বাড়ি যান।

এটি মূলত বিষ্ণুমন্দির। সত্যযুগে, বলা নেই কওয়া নেই, মহর্ষি ব্রহ্মা এখানকার পাহাড়ের উপরে বিষ্ণুর স্তবস্তুতি শুরু করে দেন। বিষ্ণু,ওই আর কি,বার খেয়ে..., মহর্ষি ব্রহ্মাকে তিনি পাহাড়চূড়ায় গরুড়সহ বিষ্ণুমূর্তি স্থাপনের অনুমতি দেন; এই বিষ্ণুমূর্তিই অলরনাথ। মহর্ষি ব্রহ্মা এই পাহাড়ে বিষ্ণুকে তুষ্ট করেছিলেন বলে পাহাড়ের নাম হয় ব্রহ্মগিরি। রাজস্থানের আলোয়ারের রাজা সম্ভবত এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করেন; সেইসূত্রে বিষ্ণু এখানে আলোয়ারনাথ বা অলরনাথ। প্রথাগত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, সঙ্গে গরুড় তো আছেনই, আর আছেন দুই কৃষ্ণজায়া, রুক্মিণী আর সত্যভামা। মন্দিরের পিছনের চন্দনসরোবরে চন্দনযাত্রা হয় বছরে একুশ দিন।
গল্প বলে অনসরকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভু জগন্নাথের দর্শন না পেয়ে আকুল হয়ে পড়েন। শ্রীজগন্নাথ তাকে জানান, অনসরকালে তিনি ব্রহ্মগিরির অলরনাথ মন্দিরে বিশ্রাম করেন। তদনুযায়ী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পান। বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামকালে তাঁর করুণায় শিলা বিগলিত হয়, হয়ে দেহচ্ছাপ সেই শিলায় উৎকীর্ণ হয়ে যায়। পাণ্ডামহারাজরা খুব গর্বের সঙ্গে সেই দেহচ্ছাপ দর্শনার্থীদের দেখান; দেখিয়ে দক্ষিণা দাবি করেন। এখানকার ক্ষীরভোগ সত্যিই দেবভোগ্য। পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রভু জগন্নাথকে যা যা ভোগ দেওয়া হয়, অনসরকালে অলরনাথজিউকেও তাই তাই ভোগ দেওয়া হয়। অনসরকালে অলরনাথজিউকে দর্শন করলে পাপমুক্ত তো হবেনই,পুনর্জন্মও সম্ভবত আর হবে না।

পুরীর সাতাশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে, ভার্গবী নদীর মোহনায় একটি বালি পাথরের টিলার টঙে পূর্বমুখিন বলিহারিচণ্ডী বা হরচণ্ডী মন্দির। দেবী এখানে অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনী; নাবিক, নৌকা ও মৎসজীবীদের রক্ষয়িত্রী - সোনার বঁটির উপর উপবিষ্টা। মহানবমীর দিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পূজা এই মন্দিরে পাঠানো হয়। দেবী নাকি রোজ রাত্রে ঘুরতে বেরোন। বালুকাময় ঢেউখেলানো প্রান্তর, বড় বড় গাছ, লোকালয়হীনতা সেই বিশ্বাসকেই পরিপুষ্ট করে। কিছুটা দূরে কালীমন্দির, খুব কম লোকই সেখানে যান।

যখন লোক এসে গাড়ির পার্কিং ফি চাইল, মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভুমির 'ডেভেলপমেন্ট'-এর জন্য, আমি চমকে উঠলাম। আবার 'ডেভেলপমেন্ট'? ওদের উন্নয়নের ধারণা তো সবুজ নষ্ট করে ইট গাঁথা, পর্যটকদের মন যোগাতে গ্রামীণ মানুষের আত্মসম্মানের অবমূল্যায়ন, মন্দিরের এই প্রশস্ত পরিবেষ্টনীকে চিৎকার কোলাহল দালালে ভরিয়ে তোলা! ভয়াল দেবীদের উন্নয়ন পরবর্তী ভবিতব্য তো আমরা ঘরের কাছের বর্গভীমায় দেখেছি - কোথায় সুবোধ ঘোষ কথিত কালাপাহাড়ের ভীতি-উদ্রেককারী দেবী, আর কোথায় বাজারের মধ্যে আসীনা গৃহপালিতা দেবী!
মন্দিরের স্বল্প দূরত্বে একটি বালিয়াড়ি পেরিয়ে বলিহারিচণ্ডী সৈকত, নির্জন, কুমারী, জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। অত্যুৎসাহী যুবকবৃন্দ পুরীর মোহনা থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে আসেন।

সেখান থেকে সতপদা। দিনটি চমৎকার। আকাশ সমুদ্রের মত নীল, তাপমাত্রা না গরম না ঠাণ্ডা - যদিও উত্তুরে হাওয়া মাঝে মাঝে জানান দিচ্ছে। ফিন এয়ারের হেলসিঙ্কি সেবু উড়ানটি ঊনত্রিশ হাজার ফুট উপরে চমৎকার দুটি সাদা রেখা টেনে গ্যাছে, তাইতে আকাশকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বস্তুত, গন্তব্যে পৌঁছানোর চেয়ে চলতেই আমার বেশি ভাল লাগে, বিশেষত অদিশার রাস্তায়। এই সমুদ্র তো এই পাহাড়, এই ধানক্ষেত তো এই জঙ্গল, এই গ্রাম তো এই বাজার, এই রেলগাড়ি তো এই পাখির দল। সতপদা চিলিকার সমুদ্রমুখের নিকটবর্তী এক পার্শ্ববিন্দু, ডলফিন দর্শনের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। দেখতে হলে নৌকা চেপে রাজহংস দ্বীপে যেতে হয়। আমাদের শুশুক দেখার আগ্রহ একদমই নেই; আমরা দেখতে এসেছি নিসর্গ, জল, গাছপালা।

এখান থেকে চার ঘণ্টার নৌকাযাত্রায় নলবন পাখিরালয়। তবে তার আগে অন্য কাজ আছে। সারথি মহোদয় এখানকার পান্থনিবাসে জানিয়ে দিয়েছিলেন আমরা দুপুরে কী কী খেতে চাই। তদনুযায়ী কচ্ছপের মাপের কাঁকড়া ও হাঙরের মাপের পারশে মাছ অহল্যার মত আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁদের প্রতি সুবিচার করে, আমরা নলবন পাখিরালয়ে। শীতের শেষ, জল নেমে গিয়ে কাদাচর (mudflats) উন্মুক্ত - সেখানে পরিযায়ী পাখির মেলা; চঞ্চলতা, অস্থিরতা, কোলাহলে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত।

মাণিকপাটনার ভবকুন্ডলেশ্বর মন্দিরটি দহিখিয়ায়। সেখান থেকে মংলাজোড়ি।
একসময় মংলাজোড়ির লোক পরিযায়ী পাখিদের দেখলেই ধরে বেচে দিত; লোকে তাই কেটে খেত। এভাবেই চলছিল,পাখিরাও মুখ ফেরাচ্ছিল। পেট আর চলে না। এমনসময়ে নন্দকিশোর ভুজবল আর পূর্ণ বেহেরার নেতৃত্বে গ্রামের মানুষ পেটের দায়ে পাখিদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ান। এভাবেই আজ মংলাজোড়ি আদিগন্ত পেরিয়ে আসা পাখিদের বাঁচায়; আজ তাদের পর্যটনকেন্দ্রে 'জগত করে যাওয়া আসা।' মংলাজোড়ি খুঁজে পেয়েছে বিকল্প রুটিরুজির পথ। সেই পাখি শিকার করা লোকগুলোই এখন পর্যটকদের নৌকায় জলে জঙ্গলে ঘুরিয়ে পাখি দেখায়, পাখিদের বংশবিস্তারের জন্যে নিরিবিলি ছাউনি তৈরি করে,২০১২ সালে আর বি এস আর্থ হিরো অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৪ সালে ইন্ডিয়া বায়োডাইভার্সিটি

অ্যাওয়ার্ড রানার আপ পুরস্কার পেয়েছেন এঁরাই। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ - যে কথামাত্র নয়, এক জীবনদর্শন, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ মংলাজোড়ি।

মংলাজোড়ি সতপদার বিপরীতে, চিলিকার উত্তরতটে, এক ছোট্ট গ্রাম - জলাভূমিতে বছরে নানা প্রজাতির তিনলক্ষ পাখি আসার সুবাদে অধুনা পাখিদের স্বর্গ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। দশ বর্গকিলোমিটার মত মিষ্টি জলের জলাভূমি প্রবাহদ্বারা চিলিকার অগভীর ব্র্যাকিশ ওয়াটার (লোনা জল ও মিষ্টি জলের মধ্যবর্তী জল, প্রধানত মোহনা ও বদ্বীপ এলাকায়) এর সঙ্গে যুক্ত। জলাভূমি গুল্মময়, মধ্যে মধ্যে শরজাতীয় লম্বা ঘাস - পক্ষীবসতির আদর্শ জায়গা। আর পাখিই বা কত রকমের...। দেখে দেখে শেষ হয় না।
কিন্তু ফেরার তাড়া! নৌকাবিহারের পর গ্রামটিকে একটু ঘুরে দেখা। চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত এখানকার দণ্ডযাত্রা অতিখ্যাত। এই প্রথা গঞ্জামের তারাতারিণী মন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পাইক আখড়া এখানকার আর এক লোকনৃত্য। পতিতপাবন মন্দির, গুপ্তেশ্বর মন্দির, নীলকণ্ঠেশ্বর দেবমন্দির, মঙ্গলা মাতা, ব্রাহ্মী মাতা, বালিমাঝি মাতা ও তারা মাতার মন্দির; আর নৌকানির্মাণ পদ্ধতি দেখে পুরী।

চতুর্থ দিন।
১৯৮০তে চাকরিতে ঢোকার পর আমার প্রথম পোস্টিং মালদায়। মালদা তখন অতি দুর্গম, যোগাযোগ বলতে হপ্তায় তিনদিন গৌড় এক্সপ্রেস। অন্য যে কটি রেলগাড়ি চলত,যথা দার্জিলিং মেল,কামরূপ এক্সপ্রেস,হাওড়া নিউ বঙ্গাইগাঁও জনতা এক্সপ্রেস,হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার - তারা উভয়দিকেই মালদা পৌঁছতেন বেয়াড়া সময়ে, কোটাও ছিল অত্যল্প, ফলে কখনই টিকিট পাওয়া যেত না; বিকল্প রাতভর বাসযাত্রা; সেটিও খুব সুখকর নয়। বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে সে এক অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব স্বাধীন জীবন - স্বোপার্জিত পয়সা, ইচ্ছা হলেই রিক্সা চড়তে পারি, বাবার শাসন নেই, বাবার বয়সী অগ্রজ সহকর্মীরা বন্ধুসম - যাবতীয় বদবুদ্ধির উদ্গাতা। আমার সেই বাধাবন্ধনহীন, গ্রন্থিবিহীন জীবনের কিছু তথ্য কিভাবে যেন সাড়ে তিনশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বাবার কানে পৌঁছেছিল। তারপর বাবা আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে মানুষের জীবনে দুবার অনেক বন্ধু জোটে, প্রথম, যখন সে চাকরিতে ঢোকে; দ্বিতীয়, যখন সে চাকরি থেকে অবসর নেয়।
ঠিক কথা! তবে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটে, লোকে জীবনে প্রথমবার কিঞ্চিৎ পয়সার মুখ দেখে, নিজেকে সচ্ছল বলে ভাবতে শেখে। সারাজীবন পিপীলিকার পশ্চাদ্দেশপেষণপূর্বক জীবননির্বাহ করিতে করিতে সহসা টাকার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমরা এমনই এসে ভেসে যাই - আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুমগন্ধরাশির মতন, হাওয়ার মতন, নেশার মতন ঢেউয়ের মতো ভেসে যাই। সদ্যলব্ধ সচ্ছলতায় কিঞ্চিৎ কেনাকাটা হল।

পঞ্চম দিন।
প্রত্যাবর্তন। এবারে আমাদের যাত্রা ১৮৪১০ পুরী-হাওড়া শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে। এই গাড়িটি সময় বেশি নেয়, তথাপি সুবিধাজনক সময়ের জন্য এটি আমার প্রিয় রেলগাড়ি। ২০১৩ - ২০১৬ আমার অফিস ছিল হাওড়ায়,হাওড়া স্টেশন থেকে সাত মিনিটের হাঁটাপথে। তখন হামেশাই অফিস ছুটির পর সন্ধ্যে সাতটায় এই গাড়িটি ধরে পরদিন সকালে পুরী। আবার ফেরার পথে রাত সাড়ে দশটায় এই গাড়িটি ধরে পরদিন সকাল আটটায় হাওড়া। অফিসেই স্নানাহার। তারপর সারাদিন কাজ করার সময়েও চোখে ঊর্মিমালা, শ্রবণে দূরাগত সমুদ্রের কলতান।
বাঁধাছাঁদা সেরে নৈশাহার। হোটেলের ঘরভাড়ার পুরোটাই আগেই দেওয়া ছিল। হোটেল ছাড়ার সময় বিল মেটানো বলতে শুধু খাবারের দাম। হোটেলশিল্পের বোধহয় নিজস্ব কোনো হিসাব আছে, যে খাবারের বিল ঘরভাড়ার চেয়ে বেশি হবে,বা সমান হবে,বা অর্ধেক হবে। আমাদের চারদিনের খাবারের (প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ একদিন বাদে,ও নৈশাহার) বিল আমাদের চারদিনের ঘরভাড়ার বিলের সমান বা অর্ধেক তো নয়ই। এমনকি সিকিও নয়। তাইতে বিল গ্রহণকারীর ধারণা হল কিছু পদ বোধহয় বিল থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারির মনোরম তাপমাত্রাতেও তিনি দরদর করে ঘামতে লাগলেন, এখানেওখানে ফোন করতে লাগলেন, খচাখচ কিবোর্ড টিপতে লাগলেন, আমাদের বসিয়ে রাখার জন্য দুরন্ত ক্ষমাটমা চেয়ে নরম পানীয় অবধি খাইয়ে দিলেন। আমরা দুজনে যে প্রতিরাতে দুটি রুটি, একবাটি ডাল আর একটা স্যালাদ খেয়েছি, সেটি উনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। দুপুরের খাবারও তথৈবচ, একদিন মোটে মাছ খেয়েছি।
হোটেলের পিছনে দৃশ্যমান - জগন্নাথ মন্দিরের আলোকিত চূড়া ও সমুখের চিরচঞ্চল বারিধিকে প্রণাম জানিয়ে, স্টেশন। এবারের যাত্রাবিরতি সাঁতরাগাছিতে; তখন সবে সকাল সাড়ে সাতটা। শাড়ি হাঁড়ি, খাজা গজা, লাঠি কাঠি - সকল লটবহর নিয়ে গাড়িতে, এবং পরিশেষে বাড়িতে।

কৃতজ্ঞতাঃ
• স্ত্রীর পত্র - রবীন্দ্রনাথ।

• নরসিংহ পাণ্ডা মহারাজ।
• শরৎ - আমাদের সারথি।
• Flightradar 24

~ পুরীর আরও ছবি ~

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূলক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সেবিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালকে বাংলা লিখতে শিখিয়েছে 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না'।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন : 2
গড় : 5.00

Like 24 people like this. Be the first of your friends.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

অনবদ্য। পুরীতে অভুক্ত থেকে বিগ্রহ দর্শন করা অকাম্য, এই তথ্যটি জানা ছিলোনা, এখন যথাস্থানে জানিয়ে রাখতে হবে। আর "অভাগার ভাবে" সম্ভবত "অভাগার অভাবে" হবে, তবে আমি নিশ্চিত নই।

- কণাদ চৌধুরী [2020-03-23]

গুজরাটে দেবাদিদেব ও পশুরাজদর্শন

অরিন্দম দত্ত

গতবছর দোলযাত্রার ছুটিটা কিভাবে কাজে লাগাবো ভাবতে ভাবতে গুজরাট ট্রিপই ফাইনাল করে ফেললাম। কর্মসূত্রে পুনেতে থাকি। ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার অফিস ছুটি। একদিন শুক্রবার ছুটি নিলেই লম্বা ভ্যাকেশন। সোমনাথ - দ্বারকা - পোরবন্দর - গির প্ল্যান পাক্কা।
২০ মার্চ অফিস থেকে ফিরে রাত ন'টার ফ্লাইটে আহমেদাবাদ। সেদিন আহমেদাবাদে রাত্রিযাপন। আহমেদাবাদ এয়ারপোর্টের কাছেই একটি হোটেল বুক করা ছিল। এখানে এক থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে প্রচুর হোটেল আছে। আমি ফ্যাভোটেল মাহের ইন বুক করেছিলাম। আহামরি কিছু না, এক রাত্তিরের জন্য যদিও চলনসই। এয়ারপোর্ট থেকে অটোতে হোটেল একশো টাকা ভাড়া। সেই অটো ভাইয়াকেই সকাল সাতটাতে হোটেলে আসতে বলে দিলাম। পরেরদিন সকাল আটটা কুড়িতে সোমনাথ এক্সপ্রেসের (জব্বলপুর - সোমনাথ) টিকিট কাটা ছিল।
সকালবেলা যথসময়ে সেই অটো ড্রাইভার এসে উপস্থিত। বলে রাখা ভালো, এই নিয়ে আমার দ্বিতীয়বার গুজরাট যাত্রা, আর দুবারই যে জিনিসটি লক্ষ করেছি তা হল অটো-ক্যাবের ড্রাইভারদের ব্যবহার, তাদের সময়ানুবর্তিতা। পর্যটকরা যে তাদের অন্যতম পুঁজি তা তারা ভালো ভাবেই জানে এবং সর্বদা তাদের খেয়াল রাখতে যেন বদ্ধপরিকর। যাইহোক সকালবেলা খালি রাস্তায় পনেরো মিনিটে স্টেশন পৌঁছে গেলাম। স্টেশনের কাছে অনেক রেস্তোরাঁ আছে যেখানে ব্রেকফাস্ট করে নেওয়া যায়। ওখানেই একটিতে .ব্রকফাস্ট সেরে ট্রেনে চেপে বসলাম। আজকাল অনেক ট্রেনেই কিন্তু প্যান্ট্রি কার থাকছে না, এই ট্রেনেও ছিল না। যদিও পথে কোনো স্টেশনে বা ট্রেনেও অন্য ভেন্ডারদের কাছে খাবারের অর্ডার দেওয়া যায়, তবে পারলে খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ সোমনাথ স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার-পরিছন্ন। অনেকটা দক্ষিণের কন্যাকুমারী স্টেশনের সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পেলাম। আমাদের সোমনাথ সাগর দর্শন গেস্টহাউস বুক ছিল। এটি মন্দির ট্রাস্ট-এর অধীনে, রিলায়েন্স কোম্পানি তৈরি করেছে আর তারাই দেখভাল করে। অসাধারণ এর অবস্থান। সোমনাথ মন্দিরদর্শনের জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা মনে হয় আর নেই। মন্দিরের ঠিক পাশেই এটি অবস্থিত। সামনে খোলা সমুদ্র। প্রকৃত-অর্থেই সমুদ্র দর্শন। গেস্টহাউসের প্রতিটি রুম থেকেই সমুদ্র দেখা যায়। সঙ্গে ভেজ রেস্তোরাঁ যেখানে খাবারের মান সত্যিই ভালো। গুজরাটে হোটেলে খাওয়াদাওয়া একটু দামী -দর্শনীয় স্থানগুলোতে তো বটেই।

গেস্টহাউসে পৌঁছেই একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যাবে প্রধান ফটক। মন্দির আর হোটেলের মাঝে একটিমাত্র কমন দেওয়াল। যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। অসাধারণ কারুকাজে সমৃদ্ধ মন্দিরটি। এটি আসলে নতুন মন্দির, সমুদ্রতটে অবিস্থত। পুরানো মন্দিরটি এর অদূরেই। এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথমটি আছে। বেশ তাড়াতাড়িই দর্শন হয়ে গেল। এবার পেয়েছে খিদে। হোটেলে ফিরে এসে সোজা রেস্টুরেন্ট অভিমুখে চললাম। খেতে খেতেই সন্ধ্যের আরতির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। খাবার শেষ করে হোটেলের বাগানে আসতেই এক অভূতপুর্ব দৃশ্য দেখতে পেলাম। মন্দিরের দেওয়ালে লাইট এন্ড সাউন্ড শো শুরু হয়ে গেছে আর তা আমরা হোটেলের বাগান থেকেই সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। পুরোটা উপভোগ করার পর এবার সন্ধ্যেবেলার সোমনাথ ঘোরার পালা। মন্দির আর মার্কেটচত্বরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। সব শেষে ক্লান্ত পায়ে গেস্টহাউসে ফিরে এসে সোজা চেয়ারটি নিয়ে রুমের ব্যালকনিতে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র, পাশে অপরূপ আলোকে আলোকিত মন্দির, সব মিলিয়ে সে এক অসাধারণ অনুভূতি যা লেখায় প্রকাশ করা যাবেনা। সমুদ্রের হাওয়াতে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল, ঘড়িতে দেখলাম রাত বারোটা। আর দেরি করা যাবেনা, কাল সকালে গাড়ি আসবে দ্বারকা যাত্রার জন্য।

ভোরবেলা আবার যথাসময়ে গাড়ি এসে উপস্থিত। এই গাড়িটি আগামী দুদিনের জন্য আমাদের সঙ্গী। সোমনাথের সাইটসিইং-এর পর সোজা চলে এলাম পোরবন্দর। সোমনাথেই আছে সেই জায়গাটি - ভালকা তীর্থ, বলা হয় এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন গাছের ডালে বসে বিশ্রামের সময় এক ব্যাধের ছোঁড়া তিরে। সেই গাছটিরও ভগ্নাবশেষ আছে, তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে মন্দিরটি। পোরবন্দরে কৃষ্ণবন্ধু সুদামার একটি মন্দির আছে। সেটি দেখে চলে এলাম গান্ধীজির পৈতৃক ভিটেতে। সেখান থেকে এগিয়ে চললাম দ্বারকার দিকে। বিকেল তিনটে নাগাদ দ্বারকা পৌঁছে প্রথমে নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ আর রুক্মিণীমাতা মন্দির দেখে সোজা হোটেলে চেক-ইন। হোটেল নারায়ণ ইন বুক করেছিলাম।মার্কেট এরিয়ার মধ্যে, মন্দির বেশি দূরে নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, আমি সাধারণত প্রায়োরিটি অনুযায়ী হোটেল বুক করি। যদি কোনো জায়গা দেখার হয় সেদিন বিকাল বা সন্ধ্যায়, তবে তার আশেপাশে হোটেল খুঁজি। আবার যদি ভোরবেলা ট্রেন বা ফ্লাইট ধরতে হয়, তবে স্টেশন বা এয়ারপোর্টের আশেপাশে। এতে অনেক ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায়, সময় বাঁচে।
নাগেশ্বর মন্দিরের সামনের মূর্তিটি 'টি সিরিজ'-এর মালিক গুলশান কুমারের তৈরি।

যাই হোক দুদিনে দুটি জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন হবার পর, হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, ফের পরের দর্শনীয় স্থান দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের দিকে হাঁটা লাগালাম। হোটেল থেকে কাছে, পায়েহাঁটা দূরত্বেই মন্দির। মার্কেট এরিয়ার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম। সেদিন ছিল দোলযাত্রার পরের দিন, মন্দিরচত্বরে তখনও আবির লেগে আছে। সেই পুণ্যস্থান থেকে দর্শন সেরে বেরিয়ে সোজা এলাম গোমতী নদীর পাড়ে। সেখানে সুন্দর একটি ঝুলন্ত ব্রিজ আছে সেটি পেরিয়ে গোমতীর তীরে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। ফিরে আসার মুখে দেখলাম দ্বারকা মন্দিরকে ক্যানভাসের ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সূর্য সাগরসঙ্গমে অস্ত যাচ্ছে। আজকের মতো দ্বারকাভ্রমণ সাঙ্গ করে হোটেলে ফিরে এলাম।

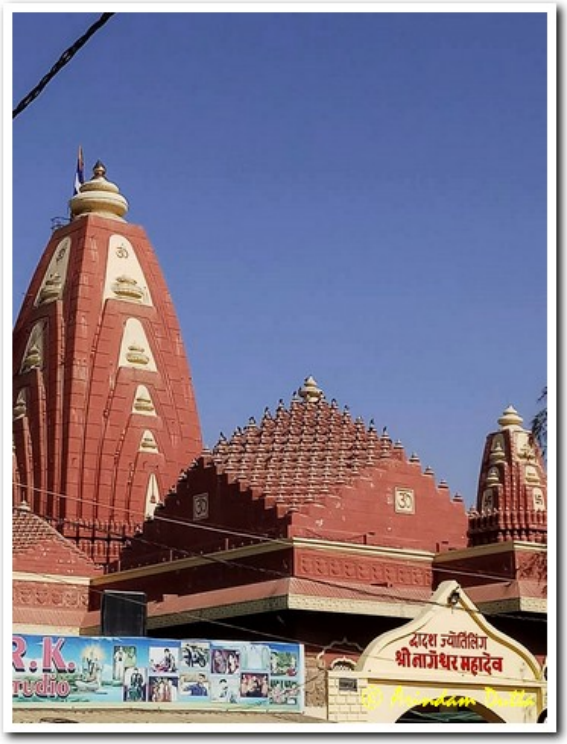

সকাল সকাল আবার বেরিয়ে পড়া হল। দ্বারকা ছাড়ার মুখেই পোহা মানে চিঁড়ার পোলাও (মহারাষ্ট্র আর গুজরাটে খুব জনপ্রিয় খাবার) দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে, এককাপ অসাধারণ চা খেয়ে আবার গাড়িতে চেপে বসলাম। এবারের গন্তব্য সোজা গির। বুকের মধ্যে খুব উত্তেজনা আর ভিতর ভিতর ঠাকুরকে ডেকে চলেছি, যেন সিংহদর্শন হয়ে যায়। ড্রাইভারের মুখে শুনে এবং নানা অনলাইন রিভিউ পড়ে যা জেনেছি, সিংহের দেখা পাওয়া নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। প্রসঙ্গত বলে রাখি গির-এর সিংহদর্শন দুভাবে করা যায়। একটি হচ্ছে দেবালয় সাফারি - এর জন্য কোনো অ্যাডভান্স বুকিং নেই, যখনতখন গিয়ে টিকেট কাটা যায়। এতে সিংহ দেখতে পাবেনই, কারণ এটা অনেকটা সেই খোলা চিড়িয়াখানার মতো,যেখানে একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে জিপ সাফারি করানো হয়। অনেকটা সেই নন্দনকানন বা চেন্নাইয়ের এর ভান্দালুর জু-এর মতো ব্যাপার। আর দ্বিতীয়টি হল জঙ্গলের কোর এরিয়া সাফারি। এর জন্য প্রতিদিনের জিপ সংখ্যা আর দর্শনার্থীসংখ্যা বাঁধাধরা। অন্তত মাসখানেক আগে অনলাইনে বুক করতে হয়। এই যাত্রায় সিংহ দেখা পুরোপুরি ভাগ্যের ওপর, কিন্তু এতে সত্যিকারের জঙ্গল ভ্রমণের স্বাদ নিতে পারা যায়। জীবজন্তুরা এখানে নিজের মর্জি অনুযায়ী চলে। এশিয়াটিক লায়নের একমাত্র বাসস্থান এটি। সিংহ ছাড়াও প্রচুর হরিণ, বাইসন, ইন্ডিয়ান সম্বর নানা রকমের জীবজন্তুর দেখা পাওয়া যায়। দুপুর তিনটে-ছটায় আমাদের স্লট বুক করা ছিল। বেলা একটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম। খিদে পেয়েছিল, ড্রাইভার গিরের মূল ফটকের আট-দশ কিলোমিটার আগে একটি ধাবায় গাড়ি দাঁড় করাল। এটিও জঙ্গলের এলাকার মধ্যেই পরে। সেখানে গ্রামীণ পরিবেশে অসাধারণ ভেজ লাঞ্চ করা হল। যখন খাওয়াদাওয়া ছেড়ে পিছন দিকে হাত ধুতে গেছি, দেখি দু-চারজন গ্রামীণ মহিলা উত্তেজিত ভাষায় কী কথা বলছে। পরে জানতে পারলাম, তারা নাকি কাঠ কাটতে গিয়ে দুটি সিংহ এবং তাদের শাবকদের দেখতে পেয়েছে। আমি আবার মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কী জানি বাবা আমার ভাগ্যে লেখা আছে নাকি কে জানে! যথাসময়ে বুকিং কাউন্টারে এসে পৌঁছালাম। বুকিংস্লিপ (অনলাইন বুকিং-এর প্রিন্টআউট),পরিচয় পত্র - আধার / পার্সপোর্ট / ভোটার আইডি সবকিছু নিয়ে আসতে হবে। বুকিং-এর সময় যে পরিচয়পত্র উল্লেখ করা হয়েছিল, সেটিই নিয়ে আসতে হবে, আর দলের সব লোকের জন্যই এটি বাধ্যতামূলক, এমনকি বাচ্চাদেরও। ইচ্ছুক পাঠকদের বলব

https://girlion.gujarat.gov.in/ - এই পোর্টালে বুকিং সংক্রান্ত সমস্ত খবর পাওয়া যাবে। যাই হোক, বুকিংস্লিপ আর পরিচয়পত্র দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে, ফরেস্ট অফিসার জঙ্গল সাফারির জন্য একজন গাইড,জীপ আর রুট ধার্য করবেন। যেকোনো রুট-ই ধার্য হতে পারে, তবে যে রুট লেখা হবে, গাড়ি শুধু সেখানেই যেতে পারবে। আমাদের জন্য রুট নম্বর ছয় ধার্য হল। গাইড দেখলাম খুব উত্তেজিত, বলল, "স্যার,সকালবেলা ছ'নম্বরে দেখা গেছে, আপনার ভাগ্য ভালো।"

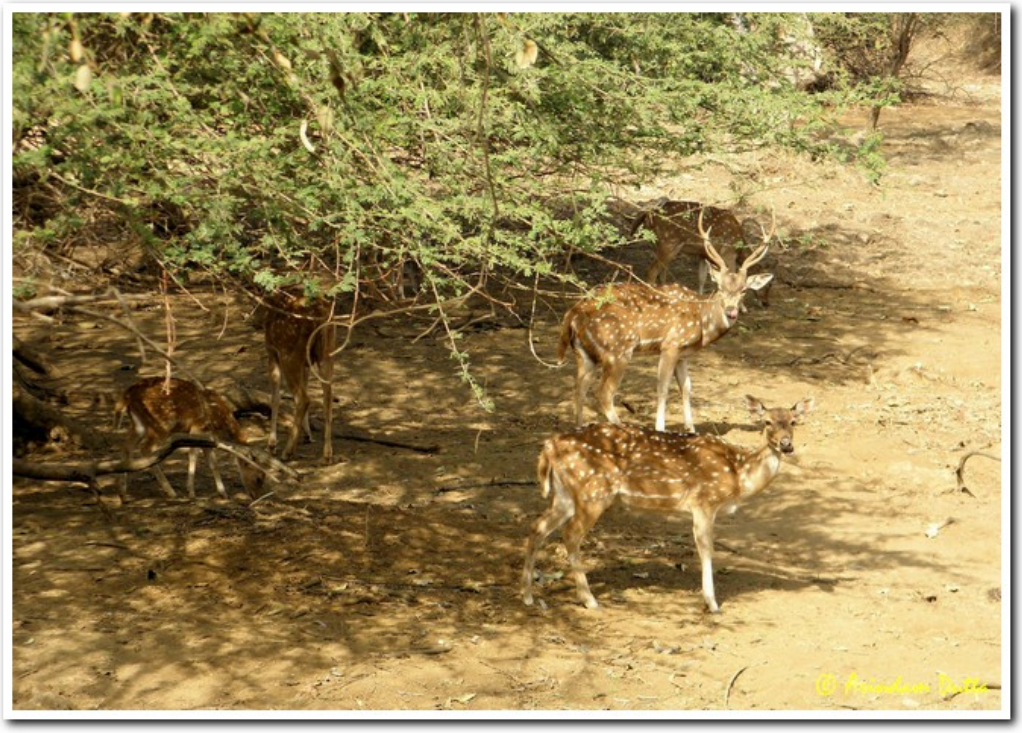

সবমিলিয়ে তিনঘন্টার জিপ সাফারি। চালু হতেই কয়েকটি হরিণ দেখতে পেলাম। এছাড়া সম্বর, বাইসন আর অজস্র হনুমানের দেখা মিলল। কিন্তু সিংহের আর দেখা নেই। গাইড একজায়গায় গিয়ে জিপ দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, একটু অপেক্ষা করে তারপর যাব, তাতে সময় হাতে থাকবে, বিকালের দিকে যদি জল খেতে তারা বেরোয়। একথা সেকথা বলতে বলতে গাইড আরো বলল, অমিতাভ বচ্চন নাকি তিনবার সাফারি করার পর সিংহদর্শন করতে পেরেছিলেন আর সচিন তেন্ডুলকার প্রথম বারেই। আচমকা উল্টো দিক দিয়ে দেখছি একটি জিপ গাড়ি আসছে। তারা খবর দিল, পাঁচ নম্বরে এইমাত্র তারা দেখতে পেয়েছে। গাইড বললো, 'পাঁচ নম্বর ক্রস করে ঠিক ছ'নম্বরে আসবে, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।' গাইড সিগন্যাল দেবার পর এবার জিপ ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। রাস্তার দুদিকে আমরা নজর রাখছি। এরমধ্যে ছ'নম্বর রুট অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে, এখনো তার দেখা নেই। হঠাৎ করে দেখি সামনে কিছু জীপের জটলা। এগিয়ে যেতে দেখি আমার ভাগ্য এযাত্রায় খুব ভালো। শাবকসহ দুটি বেশ বড়সড় সিংহী। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের ফটোসেশন চলল। সিংহেরাও ধৈর্য ধরে রইল দেখলাম। আরও কিছুক্ষণ জঙ্গলে ঘুরে ফিরে এলাম। এযাত্রায় তাহলে শিবদর্শন আর সিংহদর্শন দুইই হল!

সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট অরিন্দম দত্ত কর্মসূত্রে পুনেনিবাসী। বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে দেশেবিদেশে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আর প্রতিটি ভ্রমণপিপাসু বাঙালির মতনই, যেখানেই যখন যান, তার আশেপাশের জায়গাগুলো চেটেপুটে উপভোগ করেন। ভ্রমণের আনন্দ আরো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য অবসরে কলম তুলে নেওয়ার এটি এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 4
গড় : 4.00

Like 60 people like this. Be the first of your friends.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

Darun likhecho. Ichhe kitchen ekhani ghure asi. Ager ghora jaygar details er janno utsuk railman.

- Nayan [2020-03-19]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

মুন্সিয়ারিতে সোনাঝরা বিকেল

অরিন্দম পাত্র

~ মুন্সিয়ারির আরও ছবি ~

ছোটো থেকে খুব বেশি কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয়নি নানা কারণে। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা যেমন একটা কারণ তেমনি আবার আমার বাবা .বড়াতে যেতে খুব একটা পছন্দ করতেন না। এখনো করেন না। কিন্তু আমি ছোট থেকেই পাহাড়ের স্বপ্ন দেখতাম। একটু বড় হয়ে পড়াশোনার চাপ কমলে বিভিন্ন ট্রাভেল ম্যাগাজিন বা বইপত্র পড়তাম। এইসব ঘেঁটেই মুন্সিয়ারির প্রতি একটা অদ্ভুত দুর্বলতা জন্মেছিল। কেন জানিনা মনে হত কোনোদিন সুযোগ পেলে মুন্সিয়ারি যেতেই হবে!

তা আজ সেইদিন উপস্থিত। চকৌরি থেকে ৯০ কিমি পথ পাড়ি দেওয়া শুরু হল আমাদের। সুদীর্ঘ পথ। ক্লান্তি ক্রমশ চেপে বসছে শরীরে। শুধু মনের উত্তেজনা সম্বল করে চলেছি। একটাই কথা ভাবছি শুধু যে মুন্সিয়ারি পৌঁছাতে পারলেই আজ আর আগামীকাল বিশ্রামের সুযোগ পাব।

তবে মুন্সিয়ারিতে পৌঁছানোর পথ কিন্তু সহজ রাস্তা নয়! খুব আঁকাবাঁকা, খুব সঙ্কীর্ণ আর বিপদসঙ্কুলও বটে!! মাঝেমধ্যেই রাস্তা ভাঙ্গাচোরা, সারাইয়ের কাজ চলছে। বেশ কয়েকটা ঝরনার দেখা পেলাম - নিরন্তর পাহাড়ের মাথা থেকে ঝরে পড়ছে আর তিরতির করে রাস্তা ডুবিয়ে পাশের খাদে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় খুব সুন্দর নাম-না-জানা একটা জলপ্রপাত দেখলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বিরথি! কিন্তু ড্রাইভার বললেন, এ বিরথি নয়। বিরথির দেখা মিলল আরও ঘন্টাদেড়েক পরে। রাস্তার পাশেই বড় বোর্ডে লেখা "বিরথি ওয়াটার ফলস"!

গাড়ি থেকে নামলাম হাত-পায়ের জং ছাড়াতে ছাড়াতে। সারা গায়ে প্রচন্ড ব্যথা! তবে মুন্সিয়ারি আর খুব বেশি দূরে নেই। আর মাত্র ৩২ কিমি রাস্তা বাকি। পাশেই কয়েকটা চা, কফি আর ম্যাগির দোকান। ছেলের খুব খিদে পেয়েছিল, ওরা দুজনে দোকানে বসে চা আর ম্যাগি অর্ডার করল। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে পাশেই যে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে ওটা ধরেই পৌঁছে যেতে হবে বিরথির পাদদেশে।

রাস্তা থেকেই যদিও বিরথির গর্জন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার কাছে পৌঁছাতে গেলে চড়তেই হবে ওই খাড়া সিঁড়ি। ওদের দোকানে বসতে বলে শুরু করলাম পাহাড় চড়া!!

খুব খাড়াই সিঁড়ি। প্রায় সত্তর-আশিটা সিঁড়ি ভেঙে মাঝপথ অবধি এলাম। আরো অনেক রাস্তা বাকি, তবে গিয়ে বিরথির কাছে পৌঁছতে পারব। কিন্তু শক্তি প্রায় নিঃশেষ, পিঠের ব্যাগটা দ্বিগুণ ভারী মনে হচ্ছে। হাঁফ ধরছে খুব। খানিক বিশ্রাম নিয়ে ফের ওঠার চেষ্টা করেও রণে ভঙ্গ দিতে হল! সকাল থেকে পেটে দানাপানিও কিছু পড়েনি। তাই আর ওপরে ওঠার চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম।

মাঝপথ থেকেই দুর্দমনীয় বিরথির কয়েকটা ছবি তুলে ফেরত আসতে হল। নানা অ্যাঙ্গেলে বিরথির ছবি তুললাম। অনেক উঁচু থেকে বিরথির ওই নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখতে বেশ ভাল লেগেছিল। এরপর নীচে নামার পালা। সাম্প্রতিক সিকিম ট্রিপে বেশ ক'টা দুর্ধর্ষ ওয়াটার ফলস দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল - বচ্চন ফলস, নাগা ফলস ইত্যাদি। কিন্তু বিরথির সৌন্দর্য একটু যেন আলাদা! মনে থাকবে চিরকাল। বিরথিতে একটা কে এম ভি এন লজও আছে শুনেছি। যদি পারি কখনো পরে এসে থাকব, এই ভেবে মুন্সিয়ারির লাস্ট ল্যাপের জন্য নিজেদের রেডি করে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার সঙ্গী দুজন এই আধঘন্টার বিশ্রাম আর খাওয়াদাওয়া পেয়ে আপাতত চাঙ্গা!

শুনেছিলাম পথে পেট্রলপাম্প খুব বেশি নেই। ড্রাইভার রাজকুমার ভাইকে বলাতে উনি বললেন, চিন্তা করবেন না। তেল আপাতত যা আছে, ভালই চলবে গাড়ি। মুন্সিয়ারিতে একটা পাম্প আছে, ওখান থেকেই তেল নিয়ে নেওয়া যাবে।

দেখতে দেখতে চলে এলাম আমাদের গন্তব্য মুন্সিয়ারির হোটেল বালা প্যারাডাইজ। দোতলা ছোট্ট হোটেল, কিন্তু বেশ ছিমছাম আর পরিষ্কার। রিসেপশনে ফর্মালিটিজ মিটিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দোতলায় ঘর। ঘরে ঢুকেই দেওয়ালজোড়া বড় জানালা। রুমবয় লাগেজ দিয়ে গেল আর বলে গেল ওই জানালা দিয়েই দেখা যাবে তাঁকে!! আমার স্বপ্নের পঞ্চচুল্লি। যাকে দেখতে এত দূর ছুটে আসা মুন্সিয়ারিতে! যাকে এর আগে শুধু পত্রিকার পাতাতেই ছবিতে দেখেছি, আর দেখেছি বিনসর যাওয়ার পথে এক ঝলক, তাও স্থানীয় একজন মানুষ চিনিয়ে দিয়েছিলেন বলে।

আজ কি তার দেখা পাব? আকাশ কিন্তু মেঘে ঢাকা। আর আকাশের একদিকটা কিরকম কালো হয়ে আসছে যেন! হাতে ঠিক দু'দিন। দেখা যাক কী হয়। আপাতত এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের দিকে, রুমসার্ভিসে ফোন করতে হবে। বড্ড খিদে পেয়েছে।

আকাশ কালো করে এসেছে, ঘন মেঘ জমেছে দূরদিগন্তে। হোটেলের ঘরে বসে ভাবছি যে, আজ আর হয়তো বাইরে বেরোনো যাবেনা। মনে তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে পাহাড়িয়া মেঘ-বৃষ্টি তো, যদি কেটে যায় দুর্যোগ!

অলসভাবে বসে না থেকে চলে গেলাম হোটেলের ছাতে। ছাদটা বেশ সুন্দর, ছাউনি দেওয়া। ভিজে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। পুরো মুন্সিয়ারি টাউনটাকেই পাখির চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম। দূরের পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘের আস্তরণ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। পঞ্চচুল্লি এখনো অদৃশ্য।

হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই কোথা থেকে দমকা হাওয়া আর বৃষ্টি এসে গেল। ছাদের মাথায় শেড থাকায় ভিজে গেলাম না। বৃষ্টি চলল খুব বেশি হলে দশ মিনিট। পাহাড়ের বৃষ্টি এরকমই হয়। হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়।

বৃষ্টি থামতেই অবাক চোখে দেখলাম, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!! এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত বড় একটা ধনুকের মতো লম্বা এক রামধনু! স্বর্গীয় সেই শোভা দুচোখ ভরে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলাম। মনে মনে অনুভব করলাম যে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। এই হঠাৎ ঘনিয়ে আসা মেঘ আর বৃষ্টির জন্য মন খারাপ করছিলাম, কিন্তু তা নাহলে এই অপার্থিব দৃশ্য কি আর দেখতে পেতাম!?

যাইহোক,দুর্যোগ আপাতত কেটেছে। তবে আকাশ পুরোপুরিভাবে মেঘমুক্ত নয়। বিকেল পড়ে আসছে। তাই ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে চল্লাম নন্দাদেবী মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় মুন্সিয়ারির পেট্রলপাম্প। একদম ট্যাংক ফুল করে তেল নিয়ে নেওয়া হল, সেই তেলে আমরা দুদিন পরে কৌশানি অবধি চলে যেতে পেরেছিলাম নিশ্চিন্তে। পাম্প পেরিয়ে মন্দির যাওয়ার রাস্তাটা বেশ বেয়াড়া আর এবড়োখেবড়ো। কয়েকবার গাড়ির তলা অবধি ঠেকে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে চলে এলাম।

গাড়ি পার্ক করে অল্প কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে চলে এলাম নন্দাদেবী মন্দিরপ্রাঙ্গণ। ঢোকার মুখেই টিকিট কাউন্টার। মাথাপিছু কুড়ি টাকার টিকিট কাটা হল, বাচ্চাদের প্রবেশমূল্য নেই। তবে এই টিকিটের বৈধতা বারো ঘন্টা অবধি। কাউন্টারের বাচ্চা ছেলেটি বলল, আগামীকাল সকাল সকাল এলেও ওই টিকিট দেখিয়েই প্রবেশ করা সম্ভব হবে।

গুটিগুটি পায়ে আমরা চারজন প্রবেশ করলাম মন্দিরপ্রাঙ্গণে। আমাদের তিনজনের সাথে রাজকুমারও এসেছে। ও বেচারি গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে খুব ক্লান্ত। কিন্তু ঘোরার উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। প্রায়ই মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলছে আর আমাকে দিয়ে নিজের ছবি তোলাচ্ছে। নন্দাদেবী মন্দিরের পরিবেশটা এতটাই অবিশ্বাস্যরকমের সুন্দর যে না দেখলে বোঝানো মুশকিল!! বিশাল আয়তনের ফাঁকা সবুজ তৃণভূমির ওপরে এই মন্দির অবস্থিত। পিছনে অতল খাদ আর তার ওপারেই এই মুহূর্তে অর্ধেকটা মেঘের আস্তরণে ঢেকে বিরাজমান আমাদের সবার প্রিয় পঞ্চচুল্লি। আকাশে এখনো মেঘ আছে, তবে বৃষ্টি হচ্ছে না আর বেলাশেষের সূর্য হেলে পড়ছে ধীরে ধীরে। আলো কমে আসছে। সেই সোনালি আলো আস্তে আস্তে মন্দিরের পেছনের পাহাড়ে পড়ে চারিদিক রাঙা করে তুলছে। কিন্তু পঞ্চচুল্লিকে আলোকিত করতে পারছে না সেই আলো। আধো মেঘে ঢাকা পঞ্চচুল্লি যেন অবগুণ্ঠনে ঢাকা নববধূ! তবে তার অবয় কিন্তু দিব্যি বোঝা যাচ্ছে মেঘের আড়াল ফুঁড়ে মাঝেমধ্যেই।

"আপনারা বাঙালি?" পঞ্চচুল্লির স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে এত বিমোহিত হয়ে পড়েছিলাম যে হঠাৎ করে কথাটা কানের কাছে শুনে চমকে উঠেছিলাম। তারপর খেয়াল হল, এই বিদেশবিভূঁইয়ে এরকম সুন্দর করে বাংলা কে বলে উঠল!

পাশেই দাঁড়িয়ে মিলিটারিধাঁচের পোশাক পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মিটিমিটি হাসছেন আমাদের দেখে। আলাপ করলাম ওনার সাথে, এই মন্দির প্রাঙ্গণের কেয়ারটেকার উনি। পাশেই ছোট ঘরে ওঁর বাস। জিজ্ঞেস করলাম এত সুন্দর বাংলা শিখলেন কোথায়? মনে পড়ে গেল পাতাল ভুবনেশ্বরের বাইরের মন্দিরের পূজারীজির কথা! তাঁর পরিষ্কার বাংলার জন্য দায়ী ছিলাম আমরা অর্থাৎ বাঙালি টুরিস্টরা। তবে ইনি জানালেন

আর্মিতে কাজ করার সুত্রে বেশ কয়েক বছর উনি কাটিয়ে গেছেন কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। সেই থেকেই বাংলা বোঝেন ভালোমতই আর বলেনও ভাঙা ভাঙা, কিন্তু কাজ চলে যায়!

অনেক কথা হল ওঁর সঙ্গে। কথায় কথায় জানালেন যে মুন্সিয়ারিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অনেক উদ্যোগ নেওয়া যায় বা উচিত যেদিকে স্থানীয় প্রশাসন মন দিচ্ছেন না! খালিয়া টপ অবধি একটা রোপওয়ের বন্দোবস্ত হলে মন্দ হত না।

এইসব নানা কথার মাঝে বেলা গড়িয়ে আঁধার নামতে চলল। চারিদিকের পরিবেশ তখন অদ্ভুত সুন্দর আর মোহময়ী! মন্দিরের পেছনের বিস্তীর্ণ সবুজ বুগিয়ালে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা রকি-র (কেয়ারটেকারের পোষ্য সারমেয়) মত পঞ্চচুল্লিও তখন যেন ঘুমের দেশে হারিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। মন্দিরের আলো জ্বলে উঠেছে এক এক করে।

কেয়ারটেকার মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরাও হোটেলপানে ফিরে চললাম। রাজকুমারকে বললাম আগামীকাল সকালে আর একবার কি আসা যায় এখানে? রাজকুমার বললেন, নো প্রবলেম স্যারজি! আপনি যখন বলবেন তখনই বেরোব!

মনে মনে ভাবলাম, দেখি আগামীকাল যদি হোটেলে রুমের জানালা দিয়েই আরও ভালোভাবে পঞ্চচুল্লি দেখা যায় তো ভালোই হয়। তবে সেই রাতেই রুমের জানালাটা একটু অন্যভাবে ব্যবহার করেছিলাম - চাঁদের আলোয় আলোকিত পঞ্চচুল্লি দেখার জন্য।

ঘড়িতে রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। তারিখ ক্যালেন্ডারে ২৬ পেরিয়ে ২৭-এ অক্টোবরে পা রেখেছে। সবাই ঘুমে অচেতন। কিন্তু আমি সারাদিনের ক্লান্তি আর পরিশ্রম ভুলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি হোটেলের ঘরের জানালার একপাল্লা খুলে ক্যামেরা নিয়ে। উদ্দেশ্য চাঁদের আলোয় পঞ্চচুল্লির ছবি তোলা।

দিনদুয়েক আগেই কোজাগরী পূর্ণিমা গেছে, সেদিন ছিলাম বিনসরে। আজ মুন্সিয়ারি এসে পৌঁছেছি চৌকরি হয়ে। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়েছি নন্দাদেবী মন্দিরপ্রাঙ্গণে। রাতে এখন চেষ্টা চালাচ্ছি জ্যোৎস্নালোকিত পঞ্চচুল্লিকে ক্যামেরাবন্দী করার।

এইধরনের ছবি তুলতে একটি ট্রাইপডের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কিন্তু হোটেলের ছোট্ট ঘরে তা অসম্ভব। অগত্যা দুরুদুরু বক্ষে সাধের ক্যামেরাটিকে দোতলার জানালার একচিলতে সরু চৌকাঠে বসিয়ে চেষ্টা করলাম ছবি তোলার। ছবিটা সেরকম ভাল আসেনি। তবু সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

ভোর ছ'টার একটু আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল মোবাইল ফোনের রিংটোনের আওয়াজে। রাজকুমার ঠিক রেডি হয়ে ফোন করছেন আমায়। ওঁর কাছ থেকে দশ মিনিট চেয়ে নিয়ে দ্রুত রেডি হয়ে গরম জামা চাপিয়ে আর ক্যামেরা নিয়ে দে দৌড়। আবার যাব নন্দাদেবী মন্দিরে।
ভোরে মন্দিরপ্রাঙ্গণ একদম ফাঁকা। দু-একজন এসেছেন ভোর ভোর দেবী দর্শন করতে। ভোরের টাটকা বাতাস বুক ভরে টেনে নিলাম ভেতরে,সে এক গভীর প্রশান্তির আশ্বাস এনে দিল যেন। পঞ্চচুল্লি আজ ঝকমক করছে,ধীরে ধীরে ভোরের আলো পড়ছে পঞ্চচুল্লির পাঁচ মাথায়! স্বর্গীয় পরিবেশ! দুরকম পরিবেশের সাক্ষী হওয়া গেল - গতকাল সাঁঝবেলার নন্দাদেবী মন্দির প্রাঙ্গণ আর আজ স্নিগ্ধ ভোরবেলার মনোরম মন্দির প্রাঙ্গণ। দুইই সমান প্রিয় লাগল আমার কাছে।
তবে আজ আর কেয়ারটেকার দাদার দেখা পেলাম না। ঘন্টাখানেক কাটিয়ে আর অনেক অনেক ছবি তুলে রাজকুমারকে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। কথা হল যে আবার বেরোব সকাল দশটা নাগাদ। গন্তব্য দারকোট গ্রাম।
অনেক আগেই শুনেছিলাম দারকোট গ্রামের কথা, শুনেছিলাম মানে পড়েছিলাম বিভিন্ন ট্র্যাভেল ম্যাগাজিনে। মুন্সিয়ারিতে অবস্থিত এই গ্রাম প্রসিদ্ধ ঘরে ঘরে হাতে ও মেশিনে বোনা শীতবস্ত্রের জন্য। তাও আবার ভেড়া ও বিশেষ করে খরগোসের লোম দিয়ে!
মুন্সিয়ারিতে দ্বিতীয় দিন সকালে তাই ঠিক করেছিলাম দারকোট গ্রাম দর্শনে যাব। সেইমত সকালে প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের ৭-৮ কিমি উৎরাই নামতে হবে। রাস্তা প্রচন্ড খারাপ,জায়গায় জায়গায় সারাইয়ের কাজ চলছে, ধ্বসের পাথর সরিয়ে। সঠিক লোকেশন জানিনা, ড্রাইভারদাদা মানুষজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে চললেন।
প্রায় আধঘন্টাটাক পরে এসে পৌঁছলাম দারকোট গ্রাম। বড় রাস্তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে গ্রামের দিকে। রয়েছে দুর্গামন্দির। কিছুটা নেমে একটি বাড়িতে প্রবেশ করলাম। গৃহকর্ত্রী বারান্দায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারলেন আমরা পর্যটক। আপ্যায়ন করে ভিতরে বসালেন।

বারান্দায় সেলাইমেশিন দেখতে পেলাম। কথা বলে জানলাম এখানে প্রায় প্রতিঘরেই এই কাজ হয়। বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানেও এসব শীতবস্ত্র রপ্তানি হয়। এটিই এঁদের অন্যতম জীবিকা।
বারান্দায় তেল মেখে স্নানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওঁর ছোট্ট নাতি। তার বেশ কিছু ছবি তুললাম। ভিতরের ঘরে বসে এরপর উনি দেখালেন নানারকম শীতপোষাক - শাল, চাদর, টুপি ইত্যাদি। বেশিরভাগই খরগোস ও ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি। ছেলের জন্য খুব শখ করে একটি খরগোসের লোমের টুপি কিনলাম, অবশ্যই দামে পোষাল তাই! আর বাদবাকি জিনিসের দাম প্রচুর!
কেনাকাটা সেরে ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর একটু নীচে নেমে দারকোট গ্রামের দুর্গামন্দির দেখে ফিরে চললাম। এরপর ট্রাইবাল মিউজিয়াম দেখে হোটেলে ফেরা ও দ্বিপ্রাহরিক লাঞ্চ সারা।
আজ বিকেলে পুরোপুরি বিশ্রাম। আমাদের মুন্সিয়ারি সফর শেষের পথে। এতদিন স্বপ্ন দেখে এসেছি যে দুটো সোনালি দিনের আজ সেই দিনদুটো শেষ হতে চলেছে। অনেক ছোটাছুটি হল এই দুদিন। বিকেলে বালা প্যারাডাইজ হোটেলের ছাতে বসব মুখোমুখি - শুধু আমি আর মুন্সিয়ারি। আর কেউ না। ছেলে আর ছেলের মা এখন ভাতঘুমে ব্যস্ত। ভালই হয়েছে, কেউ আর আমাদের বিরক্ত করবেনা। মুন্সিয়ারির রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ আহরণ করব আজ প্রাণ ভরে। অদ্ভুত ছিল সেই বিকেলটা! প্রকৃতি সেদিন যেন সোনালি আলোর স্পর্শ দিয়ে মুন্সিয়ারিকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল! মুন্সিয়ারি যেন হয়ে উঠেছিল সোনার শহর এল ডোরাডো!! সোনাঝরা সেই বিকেলবেলার কথা চিরকাল মনে থাকবে আমার। তবে বিকেলে আর দেখা পেলাম না পঞ্চচুল্লির। মেঘের আড়ালেই রইল সে!

আগামীকালের গন্তব্য কৌশানী, মনকে বোঝালাম সকালটা তো রয়েইছে বেরোনোর আগে অবধি। পঞ্চচুল্লির সঙ্গে এবারের মত শেষ দেখাটা হয়েই যাবে।
শেষ দেখাটা হল পরের দিন, এমনভাবে মন ভরিয়ে দিল, যা বলে বোঝানো যাবে না!! ভোরে জানালা খুলে দেখলাম পঞ্চচুল্লির পাঁচমাথা সূর্যের প্রথম কিরণ লেগে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে! ঠিক যেন পাঞ্চালী রান্না চাপিয়েছেন তাঁর পঞ্চস্বামী পঞ্চপান্ডবের জন্য।

সেই দৃশ্য মানসপটে আজও অমলিন।

~ মুন্সিয়ারির আরও ছবি ~

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।

ওলন্দাজদের দেশে

পরাগ রঞ্জন দত্ত

৮ আগষ্ট, প্যারিস, ২০১২ - খুব ভোরে উঠতে হল। আজ আমরা দুটো দেশ পার হয়ে যাব। এপর্যন্ত পড়ে অনেকের মনে হতেই পারে এ নিছক বানিয়ে বলা নয়তো! সবিনয়ে জানাই একেবারেই তা নয়। ইউরোপের অনেক দেশ আয়তনে এতই ছোটো যে প্যারিস থেকে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস হয়ে আজই নেদারল্যান্ডসের আইন্ডহোভেন পৌঁছাব। আজ সকালবেলা প্যারিস-এর কী রূপ দেখছি! নির্মেঘ নীল আকাশ, লন্ডনের মত ঝিরিঝিরি বৃষ্টি উধাও। ব্রেকফাস্টের পর খুব তাড়াহুড়ো করতে হল। কোচ ছাড়ার অল্প পরেই ফ্রান্সের কান্ট্রিসাইডের সৌন্দর্য চুটিয়ে উপভোগ করছি। সুন্দর সব পাইন বন আর ছোটো ছোটো নদী আমাদের সঙ্গী। প্যারিস থেকে চার ঘন্টার পথ পেরিয়ে ব্রাসেলস পৌঁছে মনে হল যেন এক ঘুমন্ত শহরে প্রবেশ করলাম। ব্রাসেলস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের সদর দপ্তর। ব্রাসেলস পৌঁছে চলে এলাম এক ভারতীয় রেস্তোঁরায়, সেখানে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা।

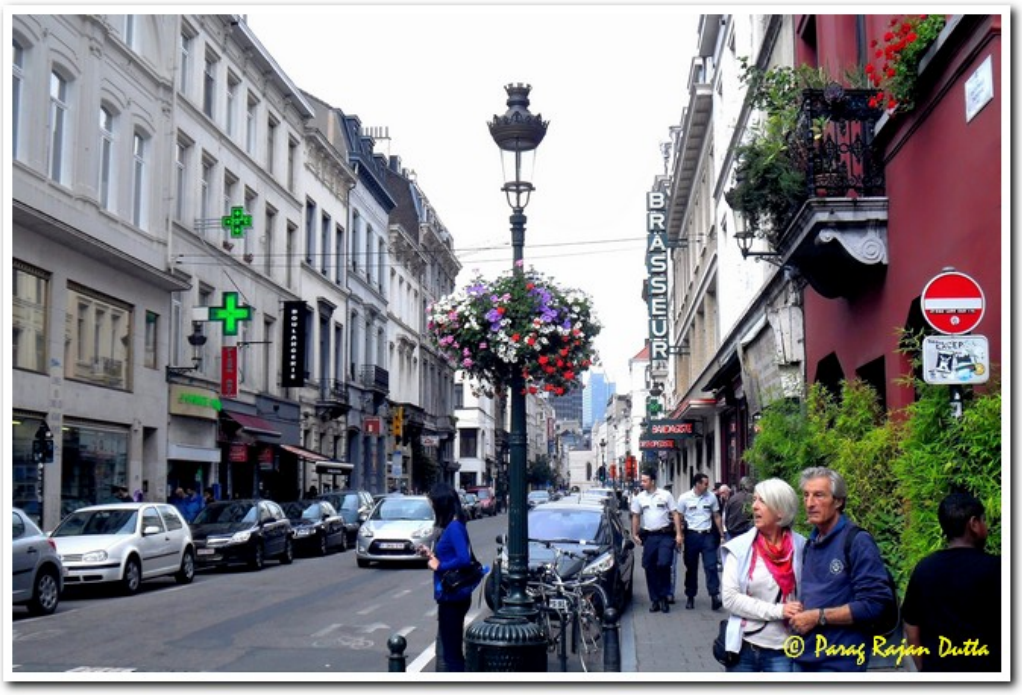

ব্রাসেলস ওরিয়েন্টেশন ট্যুর সেরে হালকা বৃষ্টির মধ্যে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আইন্ডহোভেন-এর উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মিনিটকুড়ির দূরত্বে ভেলদোভেনে NH Koningschof হোটেল আমাদের দুরাতের আস্তানা। চারদিক পাইন বনে ঘেরা এক সবুজের সমুদ্রের মাঝে বিশাল প্রপার্টি নিয়ে এই হোটেল। এক গভীর বনের মধ্যে যেন হোটেলটা। ইউরোপে আর কোথাও এমনটি পাইনি। ইউরোপের বিখ্যাত কনফারেন্স হোটেল এই Koningschof। আমরা এখন পশ্চিম ইউরোপের নিচু জমির অঞ্চলে। আক্ষরিক অর্থে নেদারল্যান্ড মানে লো কান্ট্রি। হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডসের লোকদের বলা হয় ডাচ। আমরা ওলন্দাজও বলি কখনো। এই দেশ বিখ্যাত টিউলিপ ও উইন্ডমিল-এর জন্য। দেশের প্রায় কুড়ি শতাংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিচে আর চল্লিশ ভাগ অঞ্চলই সমুদ্র থেকে মাত্র এক মিটার ওপরে। আইন্ডহভেনের নাম এলেই মনে পরে যায় ফুটবল ক্লাব পি.এস.ভি.আইন্ডহোভেনের নাম, যার আদ্যাক্ষর পি এসেছে বিখ্যাত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ফিলিপসের নাম থেকে, যার সূচনা হয়েছিল ১৮৯১ সালে আইন্ডহোভেনে জেরার্ড ফিলিপস-এর হাত ধরে।

দুটো দেশ পার হয়ে এসেছি। ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত। টেবিলে কমপ্লিমেন্টারি চা-কফি রাখা আছে। হাতে সময় কম তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে ব্রাজিলিয়ান

কফিতে চুমুক দিতেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল । এরপর সোজা চলে গেলাম ডাইনিং হলে। অনেক খাবারদাবারের মাঝে দেখি এককোণে ট্রেতে সিঙ্গাড়াও আছে। ট্যুর ম্যানেজারকে ডেকে বলি এই বিদেশে সিঙ্গাড়া কে বানালো? বললেন, দাঁড়ান একটু। পাঁচ মিনিট বাদেই এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন আপনাদের আজকের সন্ধ্যার শেফ। মনে পরে গেল ট্যুর অপারেটর বলেছিল বটে ইউরোপে বিশুদ্ধ ভারতীয় খাবার পাবেন। সত্যিই তো তাই!

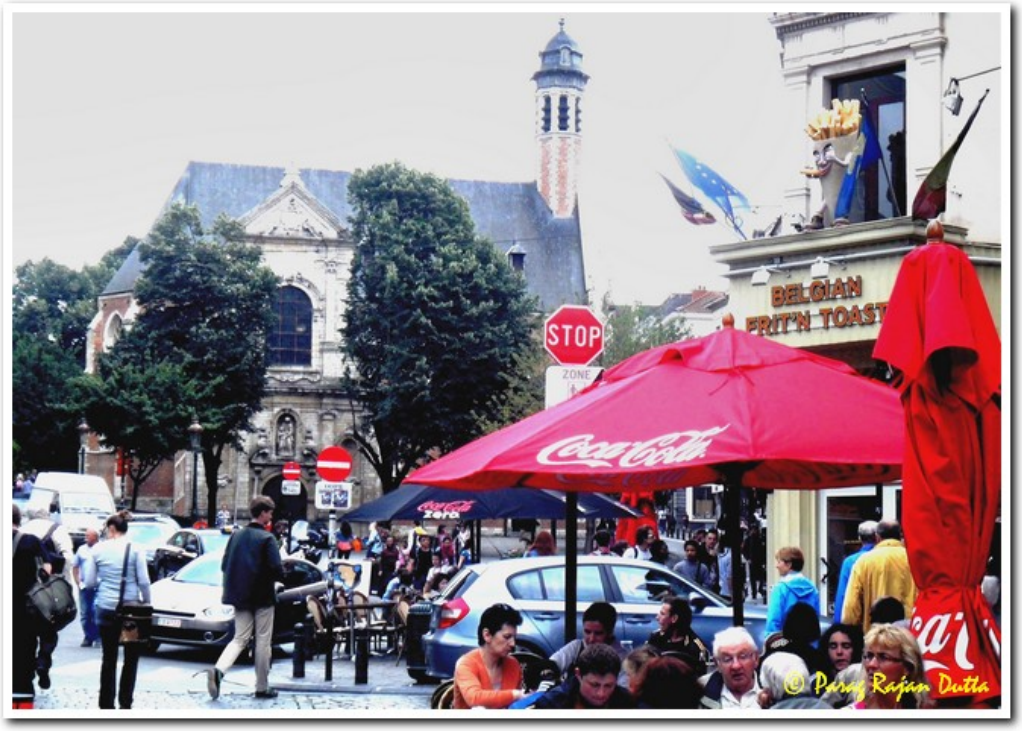

পরদিন সকাল সাড়ে ছটায় উঠে পড়লাম। এক কুয়াশামাখা সকাল। আজ দিনভর ঠাসা প্রোগ্রাম। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আটটার মধ্যে বেরোতে হবে। চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ। অজানা পাখির কিচির মিচির শুনতে পাচ্ছি। পাইন ও নাম না জানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। স্নান সেরে চলে এলাম ডাইনিং হলে। এখানে এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে বেশ জমাটি গল্প হল। এঁরা এক এন আর আই গ্রুপের সঙ্গে আমাদের ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে একই ট্যুর করছেন। ভদ্রলোক কলকাতার তবে বর্তমানে আমেরিকার বোস্টনে থাকেন, অঙ্কের প্রফেসর। ব্রেকফাস্টের পর এক অপূর্ব পরিবেশে ফটোসেশনের পর সবাই বাসে উঠে বসলাম। আজ চলেছি আমস্টারডামের পথে। তার আগে দ্য হেগ দেখব। আমাদের দুর্ভাগ্য যখন হল্যান্ড ট্যুর করছিলাম তখন আমস্টারডামের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লিসে (Lisse) শহরের পৃথিবীবিখ্যাত Keukenhof ফ্লাওয়ার গার্ডেন জনসাধারণের জন্য বন্ধ হয়ে গেছিল। আশি একর জায়গা নিয়ে নার্সিসাস, ড্যাফোডিল ও টিউলিপ ফুলের সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল ভীষণ। মে মাসের পর এলে প্রকৃতির এই রূপ আর উপভোগ করা যায়না। Keukenhof দেখতে না পাওয়ার ব্যথা নিয়ে আমরা দ্য হেগ এর পথে রওয়ানা দিলাম।
পথে টিপিকাল ডাচ কান্ট্রিসাইড দেখতে পাব ভেবেই উত্তেজনা অনুভব করছি। আমি ঠিক ড্রাইভারের পেছনের সিটে গিয়ে বসি যাতে ভালো ভিডিও ও স্টিল ফটো তুলতে পারি। কোচ কাপ্টেন লিয়ান্দ্র জিপিএস সেট করে নিয়েছে। বাস চলতে শুরু করলো সেই নির্দেশে। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার দুধারে লম্বালম্বি ভাবে কিছু প্লেক দাঁড় করানো দেখে ট্যুর ম্যানেজারকে জিগেস করি ওই বস্তুগুলো কী? উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এগুলো নাকি সাউন্ড অ্যাবজরভার-এর কাজ করে। হাইওয়ে দিয়ে চলা সমস্ত ট্রাফিকের শব্দ শুষে নেয়, যাতে বসতি এলাকার লোক শব্দদূষণের শিকার না হয়। ভাবছিলাম আচ্ছা আমাদের দেশে এরকম হতে পারেনা! প্রায় দেড় ঘন্টা পর মিউজ (Meuse) নদীর ওপর ব্রিজ পার হয়ে ইউরোপের বৃহত্তম বন্দর শহর রটারডামে প্রবেশ করলাম। রটারডাম ১৯৬২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যস্ততম বন্দর ছিল। কোচের এলসিডি স্ক্রিনে তখন সব পুরনো দিনের হিন্দি গানের ভিডিও চলছে। আর আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব দ্য হেগ যেখানে ডাচ সরকারের প্রধান কার্যালয় ও পার্লামেন্ট অবস্থিত, আর রানি বিয়াট্রিক্স-এর প্রাসাদ। এই শহরেই পাঁচটি আন্তর্জাতিক কোর্ট রয়েছে যার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস একটি।

প্রথমেই যাওয়া হল ' Modurodom' মানে 'Hollandin Miniature' দেখতে। এখানে হল্যান্ড-এর অনেক ট্রেডমার্ক যেমন উইন্ডমিল, বাঁধ, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির ক্ষুদ্র সংস্করণ সাজানো আছে। মনে হচ্ছিল যেন লিলিপুটদের দেশে আছি। আর আমরা সব এক একজন গালিভার। সেখানে একঘন্টা কাটিয়ে রওয়ানা দিলাম এক চীজ তৈরির ফ্যাকট্রির উদ্দেশ্যে। এখানে বিভিন্ন ধরনের চীজ কিভাবে তৈরি হয় দেখানো হল। বিভিন্ন ধরণের কয়েক টুকরো মুখে দিয়ে মনে হল বড় বেশি নোনতা। হল্যান্ডের চীজ জগতবিখ্যাত শুনেছি তবে মুখে দেবার পর হলফ করে বলতে পারি আমাদের দেশীয় চীজ অনেক ভালো। এরপর চীজ ফ্যাকট্রির উল্টোদিকে ছোট্ট একটা ঘরে আমাদের লাঞ্চব্রেক হল। লাঞ্চ টেবিলে কিছু আশ্চর্য মেনু অপেক্ষা করছিল, যার ভেতর অন্যান্য খাবারের মধ্যে পুরি, রায়তা ও ম্যাংগো জুস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

লাঞ্চের পর এই দেশের এক আইকনিক ল্যান্ডমার্ক - উইন্ডমিল দেখতে চললাম আমরা। এক অত্যন্ত সরু রাস্তা ধরে কোচ চলছে। বাঁদিকে সবুজ গমের খেত, অপূর্ব সুন্দর ছোটো ছোটো কটেজ, সরাইখানা, কাঁচের মত টলটলে জলে ভরা খাল, বিখ্যাত ডাচ ব্রিডের গরু চড়ছে মাঠে। ওই সরু রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাইকেল নিয়ে যাতায়াত দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। এত সবুজ ইউরোপে আর কোথাও দেখিনি। কিছুটা যাবার পর দূর থেকে বাঁদিকে দেখতে পেলাম চারদিকে যেন সবুজের মেলা। তার মাঝে এক উইন্ডমিল, যা দেখার সাধ ছিল মনে সেই কবে থেকে। সেই কবে স্কুলে পড়া চার্লস ম্যাকের 'দ্য মিলার অফ দ্য ডি' কবিতার একটা লাইন মনে পরে গেল যেখানে মিল মালিক বলছে - I envy nobody - no, not I - And nobody envies me। চারিদিকে সবুজ খেত আর জলাজমিপরিবৃত মিলের পাশে দাঁড়িয়ে এই কথা তো বলা যেতেই পারে। এক প্রশান্তি চারদিকের আকাশে বাতাসে। উইন্ডমিলের সামনে ফটোসেশন-এর জন্য বেশ কিছু সময় দেওয়া হল আমাদের। বেশ একটা রোমাঞ্চ হচ্ছিল, এরকম পরিবেশে ছবি তুলে খুব আনন্দ পেলাম। এখান থেকে আমরা টিপিকাল ডাচ উডেন .. ফ্যাকট্রি দেখতে যাব। শু্য ফ্যাকট্রিতে হাতেকলমে দেখানো হল কী করে কাঠের জুতো বানানো হয়। জেনেছিলাম এই জুতোর নামে ক্লগ (clogs) । মহিলারা নাকি এই জুতো খুব ব্যবহার করেন আর মাঠে কৃষিকাজে এগুলো খুব উপযোগী।
জুতোর কারখানা দেখে আমস্টারডামের পথে রওয়ানা দিলাম। মাঝে মাঝেই জলাজমিবেষ্টিত ছবির মত সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি আর বাড়ির পাশে সুদৃশ্য নৌকা বাঁধা। আমস্টারডাম পৌঁছে বাস আমাদের নামিয়ে দিল এক জায়গায় যেখান থেকে ক্যানেল ক্রুজ শুরু হবে। এই ক্যানেল ক্রুজ না করলে আমস্টারডাম দেখাটাই অসুম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের ট্যুর ম্যানেজার ক্রুজ-এর টিকেট সংগ্রহ করতে গেলে আমরা কজন উল্টোদিকের রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম আর তখনই নজরে এলো পৃথিবীবিখ্যাত ডাচ বিয়ার কোম্পানি Heineken International Lager বিয়ার-এর এক আউটলেট। এই Heineken এক জগতবিখ্যাত ডাচ ব্রুয়ারি এবং অনেক বিখ্যাত স্পোর্টিং ইভেন্ট, যেমন উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও পৃথিবীর নানা দেশে প্রথম সারির টেনিস টুর্নামেন্টের প্রধান স্পনসর।আমস্টারডাম শহরে ঢোকার পর মনেই হয়না এই শহরটা জলবেষ্টিত। আমস্টারডামকে ল্যান্ড অফ থাউজেন্ড ব্রিজেস বলা হয় কারণ এখানে অজস্র ছোটো ছোটো ব্রিজ আছে। এই শহরের প্রাণস্পন্দন বুঝতে গেলে জলবিহার যে অপরিহার্য তা বুঝতে পেরেছিলাম সেই ক্যানেল ক্রুজে, এক লাইফটাইম এক্সপেরিয়েন্স হয়ে থাকবে সেটা। নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের বোট এলে সবাই উঠে পড়লাম। ক্যানেল-এর দুপাশেই প্রচুর সাইকেলস্ট্যান্ড, সেখানে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সব বসে। অপূর্ব সব বাড়ি, ব্যালকনিতে ফুলের মেলা, হোটেল ও দোকানপাট সব মিলিয়ে এক সুন্দর কোলাজ তৈরি করেছে। আমস্টারডামকে দ্য মোস্ট বাইসাইকেল ফ্রেন্ডলি সিটি বলা হয়। একটা সময় ছিল যখন এই শহরের অনেক জায়গায় গাড়ির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ক্রুজে ইংরেজি ও ডাচ ভাষায় প্রি-রেকর্ডেড কমেন্ট্রি চলছে। ক্যানেলের জলে রাজহাঁস ভাসছে, ছোটো ছোটো সুদৃশ্য সব কাঠের বাড়ি জলের ওপরেই, বারান্দায় নানারকম রঙিন ফুলের টব। তবে আমাদের দেখা হবেনা অ্যান ফ্রাঙ্ক মিউজিয়াম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন হিটলারের নাজি বাহিনী হল্যান্ড দখল করে নিয়ে ইহুদিদের ওপর শুধু অমানবিক অত্যাচারই করছিলনা, পোল্যান্ডের কুখ্যাত আউসউৎজ (Auschwitz) ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারে চালান করে দিচ্ছিল। ওই সময় চোদ্দ বছরের একটি ইহুদি মেয়ে, অ্যান ফ্রাঙ্ক ও তার পরিবারের লোকজন নিজেদের বাঁচাতে এক গোপন কুঠুরিতে আশ্রয় নেয় আর গোপন কুঠুরি থেকে দেখা এই অমানুষিক বর্বরতা ডায়েরির পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিল। ওই ডায়েরি যখন Diary of a Young Girl (Het Achterhuis) হয়ে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়, আলোড়ন পরে গিয়েছিল পৃথিবীজুড়ে। সমালোচকরা প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন একরত্তি মেয়ের সেই সৃষ্টি। আমস্টারডামে আমরা আরো দেখতে পাইনি বিশ্ববিখ্যাত দুই কৃতী ডাচ শিল্পী ভ্যান গগ ও রেমব্রান্টের পেইন্টিং, তাঁদের নামে দুটো মিউজিয়াম আছে এই শহরে। ভ্যান গগ প্রায় ন'শ টি চিত্র এঁকে গেছেন যার মধ্যে স্টারি নাইট, সানফ্লাওয়ার, আইরিসেস, পপিজ, হুইটফিল্ড উইথ কর্নস বিখ্যাত। প্রায় ঘন্টাখানেকের ক্যানেল ক্রুজের রোমাঞ্চ উপভোগ করে ফিরে চললাম আইন্ডহোভেন।

শিলং-এর সেন্ট এডমন্ডস কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পরাগরঞ্জন দত্ত ভালোবাসেন বেড়াতে।

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আনদং: কোরিয়ান ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান

সম্পত ঘোষ, সায়ন্তিকা ঘোষ

বেড়াতে নয়, কর্মসূত্রেই আসা দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংসাংবুক প্রদেশের (Gyeongsangbuk province) অন্তর্গত ছবির মতন এই আনদং (Andong) শহরে। কাজের তাগিদে হঠাৎই এসে পড়া ঘর ছেড়ে অনেক দূরে একটা অজানা অচেনা দেশের কোনো এক শহরে আর তারপর কেটে যাওয়া দীর্ঘ কয়েকটি বছর, একদা অচেনা এই শহরটির সঙ্গে নিজের অজান্তেই কখন যে জড়িয়ে পড়েছি ভালোবাসায়, কখন যে বাঁধা পরে গেছি একাত্মতার সূত্রে তা জানিনা।

নাকদং (Nakdong) নদীর দুই তীরে গড়ে ওঠা প্রায় পৌনে দু'লক্ষ মানুষের বাসভূমি এই শহরটি দক্ষিণ কোরিয়ার ঐতিহ্য আর সাংস্কৃতিক রাজধানী (Capital of Korean Spirit) বলেই পরিচিত। খ্রিঃপূঃ ১ সালে জিনহান (Jinhan) জনজাতি এই শহরটির পত্তন করে এবং শহরটির নামকরণ করে 'গোছ্যাং' (Gochang) যা পরবর্তীকালে সিল্লা (Silla kingdom) রাজবংশের অধীনে আসে। ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'হুব্যাকজে' (Hubaekje) আর 'গোরীয়' (Goryeo) দের যুদ্ধে জয়ী হয়ে গোরীয় সেনা গোছ্যাং দখল করে আর শহরটির নতুন নামকরণ করে আনদং। পরবর্তীকালে আনদং-এ কনফুসিয়ানিজম প্রসার লাভ করে যা এই শহরটিকে একটি ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক আর শিক্ষার পীঠস্থানে পরিণত করে। কনফুসিয়ানিজম হল জীবনধারণের মানবতাবাদী একটি ধর্ম বা দর্শন যা প্রত্যেক মানুষকে তার মানবধর্ম বা মানবিকতাকে উপলব্ধি করতে শেখায় এবং নিজের চিন্তাশক্তির মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে (যাকে 'Tian' বা স্বর্গ বলা হয়ে থাকে) সাহায্য করে। চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস (খ্রিঃপূঃ ৫৫১ থেকে ৪৭৯) এই চিন্তাধারার প্রবর্তক আর তাঁরই নামানুসারে এই দর্শনের নাম কনফুসিয়ানিজম (Confucianism)।

শিক্ষাই মানবতা বোধের উন্মেষ ঘটায় আর মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে প্রতিষ্ঠা করে, আর তাই আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম আনদং-এর একবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত 'হাওয়ে লোক-গ্রাম' (Hahoe Folk village) এ শহরের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'বিয়ংসান সুওন কনফুসিয়ান শিক্ষাকেন্দ্র' (Byeongsan Seowon Confucian Academy) থেকে। আনদং শহরের ডাউনটাউন থেকে হাওয়ে গ্রাম যাওয়ার বাস (৪৬ নং রুট) পাওয়া যায়। এর মধ্যে তিনটি (দিনের তিনটি নির্দিষ্ট সময়ে) বিয়ংসান সুওন হয়ে হাওয়ে গ্রামে যায়, অন্য বাসগুলি শুধু হাওয়ে পর্যন্তই যায়। বিয়ংসান সুওন ওদেশের ৪৭ টি কনফুসিয়ান স্কুলগুলির অন্যতম আর আনদং শহরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 'সুওন' (Seowon) কথাটির অর্থ স্থানীয় ব্যক্তিগত বিদ্যালয় (Local Private School)। প্রথমে এই স্কুলটি পুংসান-হাইওন (Pungsan-hyeon)-এ অবস্থিত ছিল এবং পরিচিত ছিল 'পুংগাক-সোদাঙ' (Pungak -Seodang) নামে। পরবর্তীকালে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিত সিও-রয়্যু (Seoae Ryu/ Seong-nyong Yu - ১৫৪২-১৬০৭ খ্রিস্টাব্দ) সেখান থেকে সরিয়ে এনে বর্তমানস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিত সিও-র মৃত্যুর পর, ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় কনফুসীয় সমাজ (যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিওং গিয়ংসে (Jeong Gyeongse)) এটিকে পন্ডিত সিও-রয়্যু এবং তাঁর শিক্ষার স্মৃতিরক্ষার্থে উৎসর্গ করেন। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় বিয়ংসান সুওন।

সুপ্রাচীন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়বে 'মানদেরু' পটমণ্ডপ (Mandaeru Pavilion), এখানে প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থীর একসঙ্গে বসার, অধ্যয়ন করার, বক্তব্য রাখার বন্দোবস্ত ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অংশগুলি 'ইপগ্যদং' (Ipgyodang), 'দংজে' (Dongjae), 'সজে' (Seojae) এবং 'জেওংন্যদে' (Jeongnyodae) ইত্যাদি নামে পরিচিত। স্থানীয় পরিবহনের বাসে এলে মাত্র দশ মিনিট সময় পাওয়া যায় জায়গাটি ঘুরে দেখার জন্যে যা একেবারেই যথেষ্ট নয় আবার পরবর্তী বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ সময়, কাজেই পায়ে হেঁটে হাওয়ে গ্রাম যাওয়াটাই সুবিধাজনক হবে।

বিয়ংসান সুওন থেকে ৩.৯ কিলোমিটার পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেক করে পৌঁছনো যায় হাওয়ে গ্রাম। পথে দেখা মিলল এলকের (Elk - হরিণ জাতীয় একটি প্রাণী), চোখের নিমেষে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উধাও হয়ে গেল, কানে এল নাম না জানা অসংখ্য পাখিদের কল কাকলি, দেখাও পেলাম কয়েকটিকে তবে ওরা সবাই খুব ব্যস্ত, আমাদের দেখার সময় ওদের নেই।

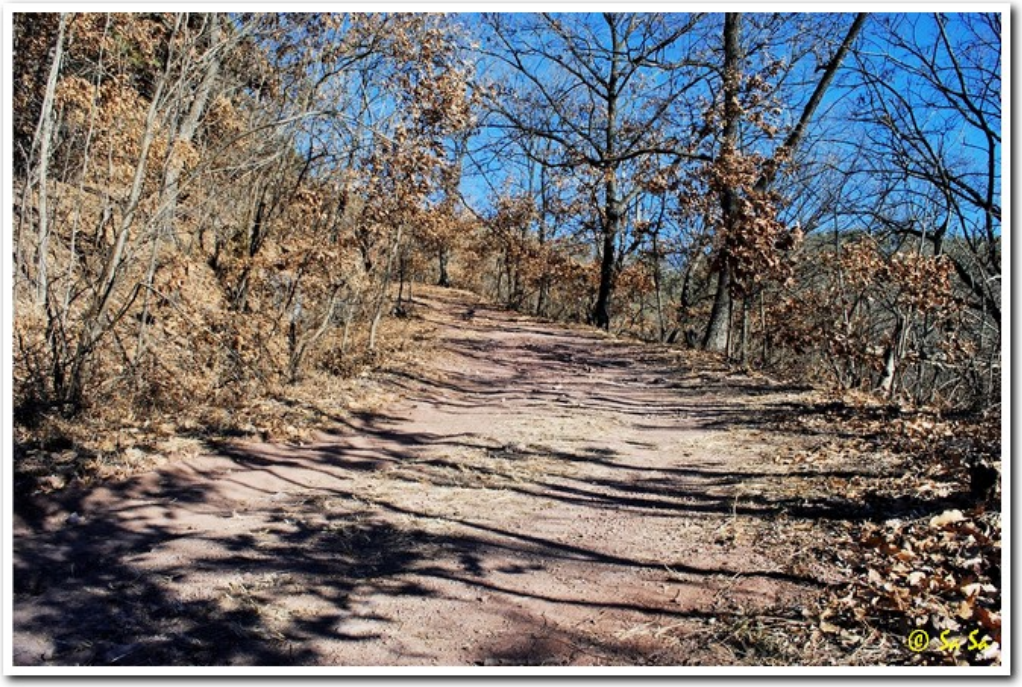

চলতে চলতে কখন যে পায়ের তলার মাটির রঙ গাঢ় লাল হয়ে গিয়েছে, যখন খেয়াল হল দূরে দেখা যাচ্ছে হাওয়ে গ্রাম। রয়্যু বংশের উত্তরসূরীদের বাস ছিল এই হাওয়ে গ্রামে। অনেক স্বনামধন্য পন্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন এই গ্রামে। হাওয়াসান (Hwasan) পাহাড়ের পাদভূমিতে অবস্থিত এই গ্রামটি নাকদং নদী দিয়ে ঘেরা আর সেই থেকেই এর নাম হয়েছে হাওয়ে (Hahoe) যার অর্থ 'নদী দিয়ে ঘেরা গ্রাম'। ইংল্যান্ডের মহারানী এলিজাবেথ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল গ্রামটি পরিদর্শন করেন। ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই হাওয়ে লোক-গ্রাম ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পায়।

ঐতিহ্যপূর্ণ কোরিয়ান ঘর (Traditional Korean House) 'হানক' (Hanok) নামে পরিচিত। পাথরের বুনিয়াদের উপরে কাঠের স্তম্ভ, কাঠের মেঝে যা 'মারু' (Maru) বলে পরিচিত, পোড়া মাটির টালির বা খড়ের চাল এবং দরজায় 'হানজি' (Hanji- মালবেরি গাছের ছাল থেকে প্রস্তুত কাগজের ব্যবহার - এগুলিই হলো 'হানক'-এর বৈশিষ্ট্য। 'হানজি'-র ব্যবহার মূলত এর খুব ভালো অন্তরণ (insulation) বৈশিষ্ট্য আর স্বচ্ছতার জন্যে হত, ঘর গরম রাখার পাশাপাশি সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করতে পারত আবার কাগজে অনেক বায়ুছিদ্র (air hole) থাকার জন্যে বায়ুচলাচলে (ventilation) সাহায্য করত। সোনালি হলুদ রঙের খড়ের ছাউনি মনে করিয়ে দিলো আমাদের গ্রামবাংলার কথা, বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। নদীকে ডানদিকে রেখে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম, এখন শীতকাল, তাপমাত্রা শূন্যের নীচে, আর্দ্রতা অনেক কম, ফসল উঠে গেছে চাষের জমি এখন শূন্য। একটু পরেই আমরা প্রবেশ করলাম গ্রামের প্রথম পাড়াতে। বিশালাকার প্রাচীর বেষ্টিত বৃহদাকার মূল ফটক দ্বারা সুরক্ষিত বাড়িগুলি দেখে ধারণা হয় যে গ্রামের অধিবাসীরা বেশ অভিজাত ছিলেন। এখানে রয়েছে 'হাদং' আবাস (Hadong residence), 'নামছন' আবাস (Namchon residence), 'জুইল' আবাস (Juil residence), 'বাকছন' আবাস (Bukchon residence), 'ইয়াংজিন' আবাস (Yangjin residence), 'ছুঁঘ্য' আবাস (Chunghyo residence) এবং 'জাকছন' আবাস

(Jakcheon residence) । পন্ডিত Ryu-র বাড়িটিও খুব যত্ন সহকারে সংরক্ষিত আর তার পাশেই রয়েছে একটি মিউজিয়াম যেখানে রাখা রয়েছে প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথিপত্র ইত্যাদি।

এখানে মহারানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর হাওয়ে গ্রাম দর্শনের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি ফার গাছ রোপণ করেছিলেন। কোরিয়ার সংস্কৃতিতে পাইন আর ফার গাছের গুরুত্ব অনেক। এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে পড়লাম 'সামসিন' (Samsin) গাছের সামনে। আরাধ্য দেবী 'সামসিন'-এর নামানুসারে এই গাছটির নাম দেওয়া হয়েছে। পরে জেনেছি দেবী সামসিন বিবাহিত মেয়েদের মাতৃত্বের মনোবাসনা পূর্ণ করার দেবী যা বৃক্ষের আকারে গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত। আজও বিভিন্ন স্থানীয় মানুষ, পর্যটক মনের ইচ্ছে কাগজে লিখে গাছের চারিধারে বাঁধা খড়ের দড়িতে আটকে দিয়ে যান। কাগজ আর কলম রাখা আছে একপাশের একটা ছোট্ট ডেস্কে।

চলতে চলতে কিছু জায়গায় রাখা বিশালাকার পোড়ামাটির জার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, একটার ওপর একটা জার রাখা আবার কখনোবা আলাদা আলাদা রাখা জারগুলি আসলে সয়াবিন সিদ্ধ করা এবং সংরক্ষণের ব্যবহৃত হত। প্রায় ছ'শ বছরের প্রাচীন সয়াবিন ফার্মেন্টেশনের পদ্ধতি সংরক্ষণ করা হয়েছে এই গ্রামে। 'দেনজং' (Doenjang) কথাটির অর্থ হল 'ফার্মেন্টেড সয়াবিন পেস্ট'। আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস হল 'মেজু' (Meju), এর অর্থ গেঁজানো সয়াবিনের খণ্ড। গ্রামের মধ্যে দু-এক জায়গায় দেখলাম পসরা সাজিয়ে বসেছে বিকিকিনির দোকান, স্থানীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন নিদর্শন প্রধানত মুখোশ, কাঠের তৈরি চামচ, রান্নার সরঞ্জাম, রুমাল, ব্যাগ ইত্যাদি। বিয়ংদে খাত (Buyongdae Cliff), নদীতীরবর্তী বালির সৈকত আর পাইন গাছের সারি ঠিক যেন ছবির মতন পরিদৃশ্যমান করে তুলেছে গ্রামটিকে।

আমাদের পরবর্তী দ্রষ্টব্য হাওয়ে-দং মুখোশ সংগ্রহশালা (Hahoe-Dong Mask Museum)। হাওয়ে গ্রামের সামনে থেকে শাটল বাসে করে পৌঁছে যাওয়া যায় অনতিদূরের হাওয়ে-দং মুখোশ সংগ্রহশালাতে। আনদং-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য হল এই মুখোশ বা মাস্ক, আর সেই সঙ্গে মুখোশনৃত্য এবং নাটক। প্রধানত অল্ডার (Alder) গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হয় এই মুখোশগুলি।

জানা যায় ১২ খ্রিস্টাব্দে .কারিয় (বা গোরীয়) রাজবংশের সময়ে Huh Doryong প্রথম এই মুখোশগুলি তৈরি করেন। মূলতঃ চোদ্দটি ভিন্ন ধরনের মুখোশ ছিল গোড়ায়, যার মধ্যে তিনটি মুখোশ (Chongak বা বিবাহের বর, Byulchae and Ttuckdari-t'al) হারিয়ে যায়, বাকি এগারটি মুখোশকে ('Imae' বা বোকা, 'Ch'oraengi' বা দ্রুত নির্বোধ হস্তক্ষেপকারী, 'Kakshi' বা বিবাহের কনে, 'Chuji' বা সিংহ, 'Paekchong' বা কসাই, 'Halmi' বা বৃদ্ধা বিধবা, 'Chung' বা বৌদ্ধ সাধু, 'Yangban' বা অভিজাত, 'Sonbi' বা পন্ডিত এবং 'Pune' বা ছেনাল নারী) কে জাতীয় সম্পত্তির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করলাম এদের মধ্যে Yangban খুব প্রচলিত। মুখোশগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলো আনন্দ, পরিতোষ, ক্রোধ আর দুঃখের প্রকাশ করে। শুনলাম রাজার সামনে এই মুখোশ পরে নৃত্যনাট্য (মূলতঃ সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর আধারিত) পরিবেশিত হত, পূর্বোল্লেখিত চারটি আবেগের মধ্যে কোনটি দৃষ্টিগোচর হবে তা রাজার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করতো। মুখোশনৃত্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য।

সংগ্রহশালার প্রবেশের মুখেই দেখলাম পৃথিবীর একটি বিরাট মানচিত্র যাতে বিভিন্ন দেশের মুখোশগুলির উল্লেখ রয়েছে। এরপর ভিতরে প্রবেশ, বিভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন জনজাতির কৃষ্টি আর জীবনের গল্পের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎই চোখ টানল ভারতের মুখোশ প্রদর্শনীতে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ছৌ নাচের মুখোশও রয়েছে। মনটা একটা অজানা আনন্দে ভরে উঠল। প্রতি বছর আনদং-এ মাস্ক ডান্স ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়, সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন নৃত্যগোষ্ঠী সেখানে অংশ গ্রহণ করে, দিনদশেক ধরে চলে বিভিন্ন দেশের মুখোশের আর মুখোশনৃত্যের প্রদর্শনী। ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রাচীনের সাথে বর্তমানের মেলবন্ধনের বিষয়টি সত্যিই শিক্ষণীয়। এবার ফিরতে হবে। বেলা পড়ে এসেছে।
পরেরদিন ঘুম ভাঙল খুব ভোরবেলা। আজ আমরা যাবো আনদং লোক-সংগ্রহশালা (Andong Folk Museum)। ভাষা বাধা হওয়ার কারণে সংগ্রহশালার যাওয়ার বাসের পথটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি ধরে রওয়ানা দিলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। নাকদং-কে সঙ্গী করে বাঁধ পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম আনদং ফোক মিউজিয়ামে, পৌঁছতে সময় লাগল মাত্র পনের মিনিট। নাকদং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান সাতটি নদী যথা হান (Han), নাকদং (Nakdong), ইমজিন (Imjin), ইয়ংসং (Yeongsang), ভুখান (Bhukhan), হানটান (Hantan), এবং গিউম (Geum)-র মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য। আগেই বলেছি যে এই নাকদং কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আমাদের শহরটি। টিবেক (Taebeak) পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ৫২৩ কিলোমিটার অতিক্রম করে নাকদং পতিত হয়েছে কোরিয়ান স্ট্রেটে। দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে নাকদং, মানব সভ্যতার নানান উত্থান-পতনের সাক্ষ্য বহন করে আজও সে মাতৃস্বরূপা, শস্যশ্যামলা

অববাহিকা তাঁর আশীর্বাদধন্য আর অববাহিকার বসতির পানীয় জলের উৎসও এই নদী। শুনেছি নাকদংয়ের অববাহিকায় বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলেছে মূলত নিওলিথিক সময়কার। প্রাচীনকালে সিল্লা, গোরীয় এমনকি জোসেওন রাজত্বের সময়কালে গিয়ংসাং অঞ্চলে পণ্য, বিশেষ করে তাজা সামুদ্রিক খাদ্য, মাছ (ম্যাকারেল) ইত্যাদি পরিবহন করা হত এই নদীপথে। সড়কপথে অনেক সময় লাগার কারণে মাছগুলি শুকিয়ে বা লবনাক্ত করে আনতে হতো, অন্যথায় পচন ধরত গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই, তাই নদীপথই ছিল ভরসা।

আজকের দিনটা ভীষণ সুন্দর, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, এই সময়ে তাপমাত্রা শূন্যের নিচেই থাকে। চারপাশ সাদা বরফের আচ্ছাদনে আবৃত, তুলোর মতন বরফ পড়েই চলেছে ক্রমাগত। দক্ষিণ কোরিয়ার সাংস্কৃতিক পীঠস্থান আনদং-এ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহ্যশালী এই সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবেশ পথের বাম হাতেই রয়েছে বিশ্রাম করার জায়গা। যারা বাড়ি থেকে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছেন তারা কিছুটা সময় বিশ্রাম করেও যেতে পারেন, আর কচিকাঁচাদের জন্য রয়েছে সুন্দর পার্ক, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। উন্নত এই দেশে প্রত্যেকটি প্রবেশপথের পাশেই রাখা থাকে দর্শনীয় স্থানটির একটি মানচিত্র এবং স্থানটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবিবরণী, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মানচিত্রে চোখ রেখে এবার চললাম সংগ্রহশালার দিকে। সংগ্রহশালার দ্বিতল বাড়িটি সৃষ্টিশৈলীর আরেকটি নিদর্শন যা সম্পূর্ণভাবে এদের ঐতিহ্যকে সাক্ষাৎ করায়। সংগ্রহশালার টিকিটঘরটি বন্ধ, আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে প্রবেশমূল্য দিয়ে প্রবেশ করতে হবে; মুহূর্তের জন্যে একটু হতাশ লাগছিল ঠিক তখনই ভিতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন অভ্যর্থনার জন্য।

অতিরিক্ত শীতের জন্যে এখানে সাধারণত ভবনগুলোর প্রবেশপথে দুটি কাচের দরজা থাকে। বাইরে থেকে প্রবেশের প্রথম দরজাটি একটু মোটাধরণের কাচের তৈরি আর পরবর্তীটি অপেক্ষাকৃত পাতলা কাচের। প্রথম দরজাটি ঠেলে দ্বিতীয়টির সামনে উপস্থিত হওয়ামাত্র সেন্সর আমাদের উপস্থিতি সনাক্ত করে দরজা খুলে দিল। বিশাল বড় হলঘরের বাঁদিকে রাখা সংগ্রহশালাসম্বন্ধীয় বইপত্র আর ডানদিকে রয়েছে অভ্যর্থনা বা তথ্যকেন্দ্র। ইংরেজি ভাষায় কোনো বই খুঁজে পেলাম না, বেশিরভাগই কোরিয়ানে লেখা, তাছাড়া জাপানি বা চিনা ভাষাতেও কিছু বই রয়েছে। সংগ্রহশালার অভ্যন্তরে ছবি তোলার নিষেধাজ্ঞা আছে কাজেই এই পর্বের ছবিরহিত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। মূল কক্ষের প্রবেশদ্বারের ডান দিকেই রয়েছে বহু প্রাচীন একটি প্রস্তরফলক, ফলকের গায়ে লেখা রয়েছে ইতিহাস। ক্রমে ক্রমে সুন্দর কাচের আবরণে সংরক্ষিত এদের জীবন ঐতিহ্য দেখতে দেখতে চললাম।

জীবনধারার বিভিন্ন পর্ব তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি শিশুর একবছরের জন্মদিন পালন। নানাবিধ খাবারের সঙ্গে রয়েছে তীর-ধনুক, পড়াশোনা করার জন্য কালি-পাথর (Ink stone), কলম এবং কাগজ। পরবর্তী পর্যায়ে যখন শিশুটি ধীরে ধীরে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে (সাধারণত পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়সের) আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচলন ছিল যা 'গ্বানর‍্যে' (Gwanrye; ছেলেদের ক্ষেত্রে) অথবা 'গ্যেরে' (Gyerae; মেয়েদের ক্ষেত্রে) নামে পরিচিত। এই সময় নব্য যুবকের নতুন নামকরণের প্রথাও প্রচলিত ছিল। বিবাহ সামাজিকভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং জীবনের অন্যতম মুখ্য অনুষ্ঠান বলে বিবেচিত হতো। বিবাহের অনুষ্ঠান 'হনর‍্যে' (Honrye) নামে পরিচিত। বিবাহের সমগ্র প্রক্রিয়াটি ছয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হত যথা 'উইহন' ('Uihon' বা পাত্রীর বাড়িতে বিয়ের জন্য নিবেদন করা এবং সম্মতি পাওয়া), 'নাপছে' ('Napchae' বা পাত্র পাত্রীর বাড়িতে জন্মের ছক আদানপ্রদান করা), 'ইয়েওঙ্গিল' ('Yeongil' বা বিবাহের দিন স্থির করা), 'নাবপে' ('Nabpae' বা বিবাহের পত্র আদানপ্রদান করা এবং উপহার আদানপ্রদান করা), 'ছিনইয়উং' ('Chinyoung' বা পাত্রীকে সামনে থেকে দেখা) এবং 'দের‍্যে' ('Daerye' বা বিবাহের দিনের অনুষ্ঠান)। পরবর্তী পর্যায়ে আসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (Funeral Rites) যা 'সাংর‍্যে' (Sangrye) নামে পরিচিত। এঁদের পূর্বপুরুষের মতে সন্তানোচিত ভক্তি (Filial Piety) জীবনের সবরকমের শিষ্টাচারের ভিত্তি। পিতামাতার জীবিতাবস্থায় অথবা মৃত্যুর পরে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সন্তানসন্ততিরা এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। পরিশেষে পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত তাকে 'জের‍্যে' ('Jerye') যার অর্থ পূর্বপুরুষের আচার বা (Ancestral rites) বলা হয়। পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফল, ভাতের তৈরি কেক ইত্যাদি নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে, আজও এই প্রথা অনেকাংশে প্রচলিত আছে। প্রদর্শনীতে রয়েছে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কক্ষ যেমন বিবাহিত নারীর কক্ষ, পুরুষের কক্ষ, আলাপ আলোচনার কক্ষ ইত্যাদি।

মূল প্রদর্শনীভবন থেকে বেরিয়ে নাকদং নদীর পাশে রয়েছে পুরাতন বাড়ির প্রদর্শনী, এগুলি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Cultural Heritage) বলে বিবেচিত হয়। পুরোনো গন্ধ গায়ে মেখে আমরা চললাম 'উলর‍্যংগ্যয়' সেতু (Wolryeonggyo বা Wolryeong bridge)-র দিকে। পবিত্র ভালোবাসার সম্মানরক্ষার্থে নির্মিত নাকদং নদীর উপর কাঠের তৈরি এই সেতুটি ৩৮৭ মিটার লম্বা আর ৩.৬ মিটার চওড়া। ব্রিজের মাঝখানটায় রয়েছে বিশ্রামস্থল। রাতের বেলায় রংবেরঙের নানান আলোতে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে উলর‍্যংগ্যয়, তবে এবার আর সেটা দেখা হবে না, তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ফিরতে হবে কিন্তু তার আগে চাই কফি, কাজেই সামনের কফির দোকানে একটু বসা আর তারপর বাড়ি ফেরা।

ভূ-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন সায়ন্তিকা ঘোষ, সুযোগ পেলেই পাহাড়ের হাতছানিতে মন্ত্রমুগ্ধের মতন সাড়া দেন। ভালোবাসেন রান্না করতে আর ফটো তুলতে। সম্পত ঘোষ আগ্রহী বিভিন্ন জনজাতির জীবন আর জীবিকা বিষয়ে জানতে। ভালোবাসেন সাইকেল চালাতে, বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করতে আর প্রবন্ধ পড়তে।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন : 1

গড় : 5.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

হলং-এ দুরাত্তির

বাপ্পাদিত্য বর্মন

'জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে। হলংকে দেখে প্রথমবার ডুয়ার্সে গিয়ে আমার সেই রকম মনে হয়েছিল। আর এইখানে থাকার একটি ইচ্ছা কলেজ পড়ার সময় থেকেই ছিল। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষাই ছিলাম। সেই কাঙ্খিত বুকিং পাওয়া গেল অক্টোবর ২০১৮ পুজোর ঠিক পর পর। দুই রাত্রির জন্য দুটি ঘর বুক করা হল।

উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া জঙ্গলে হলং এর অবস্থান। জলদাপাড়ার চেকপোস্টে পৌঁছে যাবতীয় সই সাক্ষর করে গাড়ি ছাড়ার অনুমতি পাওয়া গেল। এন এইচ থার্টি ওয়ান সি (NH31C) থেকে জঙ্গলের মধ্যে ৬ কিমি ভেতরে হলং বাংলো। প্রবেশ পথেই দেখা গেল বড় একটা সম্বর হরিণ। নিরিবিলিতে ঘাস খাচ্ছিল। আমাদের গাড়ির আওয়াজে রাস্তা পার হয়ে গেল। আর একটু এগিয়ে জোড়া হাতি। মালঙ্গি ও চম্পাকলি। এরা কুনকি হাতি। অবশেষে কাঠের ঘরে পুরোপুরি আধুনিক সুযোগ সুবিধা যুক্ত হলং বাংলো। বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে হলং নদী। নদীর ওপারে আছে সল্ট পিট। এখানে পশুরা লবণ খেতে আসে। সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে বড় দাঁতাল হাতি। সল্ট পিটে সর্বক্ষণ হরিণ এবং ময়ূরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সন্ধ্যায় চারদিকের নিস্তব্ধতার সঙ্গে চাঁদের আলো এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করল। সার্চলাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হল সেই আলোতে প্রাণী দেখার জন্য। সল্ট পিটে সন্ধ্যেতেই হাজির একটা গণ্ডার। সঙ্গে বেশ কিছু বাইসন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের শব্দ অদ্ভুত থেকে অদ্ভুতে পরিণত হতে লাগল।

হলং-এ আছে ভিউ রুম। ভিউ রুম থেকে সামনের জঙ্গল এবং সল্ট পিট পুরোপুরি দেখা যায়। এখানে রাতের খাবার সময় সাড়ে আটটা। জঙ্গলের মধ্যে মোবাইলের .নটওয়ার্ক খুবই ক্ষীণ। খাওয়ার পরে নিচের নুড়িবাঁধানো পথে মোবাইলের চেষ্টা করার সময় ঘটে গেল অবাকরা কাণ্ড। হঠাৎ দুইজন কর্মী আমাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো বারান্দায়। দেখি আমার পিছনে একটা গণ্ডার আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। প্রায় দুঘন্টা বাংলোর লনের ঘাস

খাওয়ার পর সেটা পিছনের জঙ্গলে অদৃশ্য হল। সারারাত্রি জেগে চলল সার্চলাইট জ্বেলে সল্ট পিট দেখা। দেখা গেল পনেরো-ষোলোটা হাতির দল। পরের দিন সকালে এলিফ্যান্ট রাইড। ভোর সাড়ে পাঁচটা, সাড়ে ছটা এবং সাড়ে সাতটা এই তিনটে সময়ে রাইড হয়। বাংলোর গেট থেকে হাতির পিঠে চড়তে হয়। একটি হাতির পিঠে চারজন। হাতির কানের পিছনে পা দিয়ে আঘাত করে অসামান্য দক্ষতায় মাহুতরা আমাদের নিয়ে চলল গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে। যাওয়ার পথে দেখাতে লাগলো হাতিদের প্রিয় ঘাস, বিভিন্ন গাছ, ফল ইত্যাদি।

এক ঘন্টা হাতির পিঠে চড়ে ঘোরায় দেখা গেল নদীতে একটা গণ্ডারের ডুবে থাকা, একদল হরিণ, ময়ূর। তারপর সারাদিনে হলং নদীর বাঁধানো সিঁড়িতে বসে অগণিত ময়ূর, হরিণ, বাইসন, পায়রা, নাম অজানা পাখি দেখে কেটে গেল।

সেটা ছিল কোজাগরি পূর্ণিমার রাত। গতদিনের মত একটা গণ্ডার সন্ধ্যা হতে না হতেই হাজির বাংলোর ঘাস খাওয়ার জন্য। ঠিক আমাদের জানলার নিচে তার ঘাস খাওয়ার মসমস আওয়াজ যেন বাংলোর সন্ধ্যার নীরবতাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিচ্ছিল। পূর্ণিমার স্বচ্ছ আলোয় হালকা শীতে জানলা থেকে সমগ্র এলাকা যেন অদ্ভুত মায়াবী অরণ্যে পরিণত হল। নিজেকে কোলাহলপূর্ণ পৃথিবী থেকে বহুদূর গ্রহের একজন বলে মনে হচ্ছিল।

পরের দিন সকালে আমাদের ফেরার পালা। সকালে দেখা গেল ছোট হলং নদী পেরিয়ে একটা গণ্ডার যেন আমাদের বাংলোয় আসার চেষ্টা করছে। কোন কারণে মনের ভুলে শেষপর্যন্ত অন্য দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। সে যেন আমাদের বিদায় জানিয়ে গেল।
হলং-এ ঘর আছে মোট আটটি। এর মধ্যে পাঁচটি ঘর সাধারণ ট্যুরিস্টদের জন্য বুকিং দেওয়া হয়। www.wbtdcl.com -এর মাধ্যমে একমাস আগে বুকিং দেওয়া হয়। হলং-এর বুকিং ক্যানসেল করা যায় না এবং কোনোরকম ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় না। বৃহস্পতিবার হলং বন্ধ থাকে। এখন হলং-এর নন এসি রুমের ভাড়া ট্যাক্স ছাড়া আড়াই হাজার টাকা। এছাড়া ব্রেকফাস্ট, সন্ধ্যের চা এবং ডিনারসহ জনপ্রতি চারশ টাকা। এলিফ্যান্ট রাইড জন প্রতি আটশ টাকা। বাংলোর চেকইনের সময়ই রাইডের ফর্ম ফিলআপ করে নেওয়া হয়। হলং-এ আছে দুটি ভিউ রুম। ঘরে বসেই সল্ট পিটের নুন খেতে আসা বন্যপ্রাণীদের উপভোগ করা যায়। আগে আসার ভিত্তিতে ভিউ রুম দেওয়া হয়।
এখান থেকে ঘুরে দেখা যায় চিলাপাতা জঙ্গল, খয়েরবাড়ি বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র, টোটোপাড়া, তিস্তা ব্যারেজ ইত্যাদি।

পেশায় শিক্ষক বাপাদিত্য বর্মনের নেশা ভ্রমণ।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 2
গড় : 3.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বনশঙ্করী আম্মার মন্দির দর্শন

তড়িৎ সাধু

কর্ণাটক বেড়াতে এসে গত পরশু থেকে হসপেটের একটা হোটেলে আছি। গতকাল সারাদিন হাম্পি ঘুরেছি। আজ সকালে স্নান সেরে হোটেলের নিচের তলার ক্যান্টিনে ধোসা, ইডলি ও কফি সহযোগে ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে এসে দেখলাম আমাদের গাড়ি হাজির। ইব্রাহিম তার সাদা রাজহাঁস-এর মত ইন্ডিগো গাড়িটা মোছামুছি করছে। খুব যত্নে রেখেছে গাড়িটাকে। আমরা দেরি না করে বেরিয়ে পরলাম।
আজ প্রথমে যাবার কথা বাদামি। গাড়ি চলতে শুরু হতেই ইব্রাহিমেরও কথা শুরু হয়ে যায়। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথাবার্তা বলে ও। অবশ্য আমাদের হিন্দি ইব্রাহিমের থেকেও খারাপ। অসুবিধা হয় না। আজ পৌষ সংক্রান্তি,ইব্রাহিম বলতে থাকে 'বাদামি যাবার আগে বনশঙ্করী আম্মার মন্দির ঘুরে চলুন। এখন রথের মেলা চলছে। পুজোয় খুব ধুমধাম। আপনাদের ভালো লাগবে।' আমাদের রাজি না হওয়ার কোনো কারণ নেই। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ি মূল রাস্তা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সরু জঙ্গলের রাস্তা ধরল, ছেঁড়া ছেঁড়া জঙ্গল,পরক্ষণেই পৌঁছে গেলাম মন্দিরের কাছাকাছি। প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে। পার্কিং পেতে অবশ্য অসুবিধা হল না।

সামান্য হেঁটে মন্দিরের সামনে এসে পড়লাম। মন্দিরের উল্টোদিকে রাস্তার অপরপাড়ে বড়ো বাঁধানো জলাশয় হারিদ্রা তীর্থ। জলাশয়ের তিনদিকে বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে জল পর্যন্ত। চারদিক খুব একটা পরিছন্ন নয়, লোকজন স্নান করছে, কাপড় কাচছে। স্নানাদি সেরে পুজো দিতে চলেছে লোকজন। প্রবেশপথের দুপাশে পুজোর সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। চূড়ো করে সাজানো রয়েছে নানারঙের আবির। অনেক দোকানির মাথায় মুসলমানি টুপি দেখে একটু খটকা লাগল। পরে ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম পূজার সামগ্রী বিক্রি করে যারা, তাদের অধিকাংশই মুসলমান।

বাইরে জুতো রেখে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশপথের দুপাশে সুউচ্চ বাতিস্তম্ভ। সামনে একটি উঁচু ধাতবনির্মিত স্তম্ভ। চত্বরে ভক্ত দর্শনার্থীদের ভীড়। ভাষার সমস্যা সত্ত্বেও দুয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। অষ্টাদশ শতকে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। বনশঙ্করী মাতা দেবী পার্বতীর একটি রূপ। অষ্টভুজা সিংহবাহিনী অসুরনিধনরতা। এখন বনশঙ্করী যাত্রা উৎসব চলছে। বাইরে রথ সাজানো হয়েছে। দেবী রথে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবেন। প্রচন্ড ভিড়ে মন্দিরের ভিতর দেবীদর্শন করা গেল না।

হঠাৎ দেখতে পেলাম কয়েকজন গান্ধীটুপি পরিহিত লোক সুসজ্জিত দোলা কাঁধে ফুলেঢাকা দেবতাকে নিয়ে স্নান যাত্রায় চলেছে। মন্দিরচত্বর ঘুরে বাইরে এলাম। রাস্তা ধরে কিছুটা যেতেই সুসজ্জিত বিশাল রথটি নজরে এল। চল্লিশ ফুটেরও বেশি উঁচু রথটির মাথায় রংবেরঙের পতাকা উড়ছে। রথটি খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। এদিকটায় এখনো বিশেষ ভিড় নেই। আর দেরি না করে এবার পার্কিংয়ের দিকে পা চালালাম। গন্তব্য বাদামি গুহা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক তড়িৎ সাধু ভালোবাসেন বেড়াতে। ইদানীং সেইসব ভ্রমণের স্মৃতি বিভিন্ন ভ্রমণপত্রিকার জন্য লিখে ফেলছেন ল্যাপটপ-কিবোর্ডে আঙুল চালিয়ে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 2
গড় : 3.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend